মহাশূন্যের রহস্য

লেখক : উইলি লে

অনুবাদক : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য



শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :

অরুণ কুমার পুরকায়স্থ

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

অক্টোবর, ১৯৬০

মুদ্রক :

হরিহর প্রেস

সমীর কুমার বসু

৯৩।২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ ১·৫০ নঃ পঃ

ভূমিকা

প্রায়ই বলা হয় যে, আনন্দদান করা বা শিক্ষা দেওয়া এবং অন্য কোন উপায়ে যা জানবার সুযোগ নেই, সে বিষয়ের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হলো বই লেখবার উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে আর একটি কথা যোগ করা যায়—সেটি হলো এই যে, কোন বই একসঙ্গে এই দুটি কাজই করতে পারবে না কেন, তার কোন সত্যিকার কারণ নেই। চিত্তাকর্ষক কোন উপন্যাস থেকেও শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে; দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়—বিশেষ কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অথবা ইতিহাসের কোন অধ্যায়ের এমন নিখুঁত বর্ণনা হতে পারে যে, বই শেষ করে পাঠকের মনে হবে যেন সে সব তার একান্ত পরিচিত ব্যাপার। অনুরূপভাবে একথাও সত্য যে, অন্ততঃ দু-শ' বছর ধরে যে সব শিক্ষামূলক পুস্তকাদি লেখা হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি—সেগুলি দূরবর্তী দেশের বিষয় অনুসন্ধান সম্পর্কেই হোক অথবা অতীত যুগের বিষয় সম্পর্কেই হোক,—খুবই চিত্তাকর্ষক। বস্তুত, বিজ্ঞানের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাঠের বিশেষ উপযোগী—অবশ্য তার বিষয়বস্তু যদি পাঠকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হয়।

এই বিচারে এই বইখানি বস্তুতঃই শিক্ষামূলক। এতে বিভিন্ন ধরণের রকেট, কেমন করে সেগুলি তৈরী হয়েছে ও কেন করা হয়েছে এবং (কাহিনীর সঙ্গে যদি প্রয়োজনীয় হয়) কে করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে। তাছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে সব

তথ্যাদি হয়তো জানা আছে অথবা যার কোন কোন বিষয় এখনও রহস্যপূর্ণ এবং কেন তা রহস্যপূর্ণ—সে সব কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, কেউ যদি প্রতিভার ব্যাপারে বিস্মিত হয়ে চিন্তা করে অথবা ভারহীন উড্ডয়নের সময় কি রকম অনুভূতি হয়, সেটা নিজে অনুভব করবার চেষ্টা করে, তবে সে কোন রকমই বিরক্তি বা ক্লান্তিবোধ করবে না।

বর্তমানে যে মহাশূন্যের যুগ আরম্ভ হয়েছে, সেটা যেমন সীমাহীন পরিপ্রেক্ষণের ব্যাপার তেমনই আবার সীমাহীন কল্পনার বিষয়ও বটে! শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুবিধ ক্রমোন্নতির মত মহাশূন্য-যুগ বেশ আকস্মিক ভাবেই অবির্ভূত হয়েছে। প্রথম ঔপপত্তিক যুক্তিতে এটা-ওটা সব কিছুই করা সম্ভব বলে মনে হয়; কিন্তু নানারকম ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে যখন কিছু বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে তখন মানুষ এই ভেবে বিস্মিত হয়ে যায় যে, এসব ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে কেমন করে সেটা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। যখন কিছু করা যথার্থই সম্ভব হয়, তখন বিভিন্ন স্থানে তা স্বাভাবিকভাবেই সংঘটিত হয় এবং স্থান বিশেষে কার্য-প্রণালীর তারতম্য ঘটে থাকে। যখন অনুসন্ধানের কোন নতুন ক্ষেত্র উদঘাটিত হয়, তখন তার ফলাফল বন্যার জলের মত প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা। সেই পট ভূমিকার বিষয় জানা থাকলে সেই তথ্যাদির তাৎপর্যও বুঝতে পারা যায়। সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত এই ছোট ছোট তথ্যের সংকলন সেই পট-ভূমিকার কাজ করবে বলে আমি আশাকরি; যাতে কোন নতুন পরিণতির কথা পাঠ করে আপনি বলতে পারবেন—হ্যাঁ, এই ধরণের পরিণতিই ছিল প্রত্যাশিত।

উইলি লে

মহাশূন্যের আরম্ভ কোথায় ?

একটা উড়ো-জাহাজের (এয়ার-লাইনার) ভিতরের দিকটা দেখিয়ে বছর কয়েক পূর্বে 'নিউ ইয়র্কারে' একটা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ছোট্ট একটি ছেলে তত্ত্বাবধায়ক-মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো— আমরা কি এখন মহাশূন্যে আছি? প্রশ্নটা শুনে ছেলের মা যেন বিব্রত বোধ করছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রশ্নটা কিন্তু মোটেই অযৌক্তিক ছিল না; কারণ—ধরুন, উড়ো-জাহাজটি যদি তখন ২০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে থাকে, তাহলে কোন কোন দিক থেকে একথা অবশ্যই বলা চলতো যে, উড়ো-জাহাজের যাত্রীরা তখন মহাশূন্যের প্রান্তসীমার কাছাকাছি উপনীত হয়েছিলেন।

কিন্তু সবই নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর; কারণ, 'কোথা থেকে মহাশূন্য আরম্ভ হয়েছে'—এই সহজ প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই। অথবা, যেহেতু এটি দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল, সেহেতু এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হয় না—উত্তর হতে পারে অনেক রকমের।

পৃথিবী একটি শিলাময় গোলক, সূর্য্যের চতুর্দিকে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে—একথা ছেলেবেলায় স্কুলে প্রত্যেকেই শিক্ষা করেছেন। এর

পৃষ্ঠদেশ খুব হাল্‌কা একটি বায়ুমণ্ডলের দ্বারা সুরক্ষিত। এই বায়ু-মণ্ডলকে অনেক রকমের অদ্ভুত কাজ করতে হয়। সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনী রশ্মি (আলট্রা-ভায়োলেট রে) যাতে অতিমাত্রায় পৃথিবীর বুকে এসে না পড়ে, এই বায়ুমণ্ডল তার ব্যবস্থা করে। পৃথিবীর দিকে ছুটে-আসা অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডের গতিরোধ করে এই বায়ুস্তর। মহাজাগতিক রশ্মির অনেকটাই এই বায়ুস্তরে শোষিত হয়ে যায়। এসব ছাড়াও বায়ুমণ্ডল জলরাশির সঞ্চলনেসহায়তা করে এবং ভূ-পৃষ্ঠকে গরম রাখবার জন্যে কম্বলের মত কাজ করে।

এসব বিভিন্ন রকমের কার্যকারিতা দেখে যে কোন লোকের সহজেই মনে হতে পারে যে, জলে-স্থলে যাবতীয় জীব-জগৎকে রক্ষা করবার জন্যেই যেন ধরিত্রী-মাতা শত শত মাইল পুরু এই বায়ুমণ্ডলের কম্বল দিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই আশ্চর্য কম্বলটা কেবল বিচিত্র কর্মকুশলীই নয়, অতি হাল্‌কাও বটে! আমরা যা ভাবি মহাশূন্যের অনেক কাছে আছি। সমুদ্র-পৃষ্ঠের সমতলে যে বায়ুর চাপ আরামদায়ক বোধহয়, তিন মাইল ঊর্ধ্বে সেই চাপ তার অর্ধেক কমে যায়। দশ মাইল ঊর্ধ্বে সেই চাপ, সমুদ্র-পৃষ্ঠের চাপমাত্রার দশ ভাগের এক ভাগ এবং বিশ মাইল ঊর্ধ্বে একশো ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়।

অবশিষ্ট এই একভাগকে যদি উপেক্ষা করা যায়, তবে ১০০,০০০ ফুট উপরে উঠতে পারলে যে কেউ অনায়াসে বলতে পারে যে, সে মহাশূন্যে আছে। যেহেতু রকেট-চালিত এরোপ্লেন ১০০,০০০ ফুটেরও বেশী উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছে, যেহেতু তাদের পাইলটেরা মহাশূন্যে গিয়েছিলেন বলে দাবী করতে পারেন এবং সম্ভবতঃ তা করেনও। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। এর সবটাই নির্ভর করে মনের প্রতিক্রিয়ার উপর। একথা সবাই

জানেন, ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকল্পে রেডিও-ইঞ্জিনিয়ারেরা হ্রস্ব রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত করবার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বাকাশের কোন কোন বায়ুস্তরের সাহায্য নিয়ে থাকেন—অন্যথায় এই যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এই ঊর্ধ্ববায়ুস্তরগুলিকে 'আয়নায়িত স্তর' বলা হয়। এই আয়নায়িত স্তরের যেটি সবচেয়ে বেশী উঁচুতে আছে, তাকে বলা F_2 স্তর। এই স্তরটিকে প্রায় ৩০০ মাইল ঊর্ধ্বে অবস্থিত দেখা যায়। কাজেই কোন রেডিও-ইঞ্জিনিয়ার যদি বলেন যে, তাঁর মাথার উপর ৩০০ মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল আছে, তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে একথাটি মোটেই অসঙ্গত হবে না। অবশ্য অত উচ্চতায় বায়ু খুবই বিরল, তবুও কিন্তু এমন তিনি একটা স্তরের সন্ধান পাবেন, যার কিছু একটা কার্যকারিতা রয়েছে।

রকেট-বিশেষজ্ঞ কিন্তু সেই একই প্রশ্নকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। বায়ুশূন্য স্থানে রকেট-মোটর খুব ভাল রকম কাজ করে, কারণ, রকেট থেকে নির্গত ঝাপ্টার বেগ মন্দীভূত করবার মত বাতাসের অস্তিত্ব সেখানে নেই এবং বাতাসের কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকায় রকেটটিও সহজেই এগিয়ে যেতে পারে। মোটের উপর রকেট বিশেষজ্ঞেরা এমন একটা জায়গা চান, যেখানে কোন রকম প্রতি-বন্ধকতা নেই। কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, এমন কোন স্থান পেলে তিনি মহাশূন্যে আছেন বলেই অনুভব করবেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করবেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রেডিও-ইঞ্জিনিয়ারের হিসাব থেকে তাঁর এই হিসাবে দূরত্বের পরিমাণ অনেক কম। কৃত্রিম উপগ্রহ তাঁর প্রাথমিক উচ্চতা ১২০ মাইল থেকে প্রায় ১৬০ মাইল অবধি বাড়িয়েছে। এর উপরে পরিমাপযোগ্য কোন প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব নেই বলেই মনে হয়। কাজেই রকেট-ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে মহাশূন্য আরম্ভ হয়েছে এক-শ' ষাট মাইল উপর থেকে।

আকাশ-বিহার বিস্থার ইঞ্জিনিয়ার (Aeronautical Engineer) কিন্তু সব ব্যাপারটাকেই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখেন। তিনি চান, বাতাসের কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকুক; কারণ বাতাস না থাকলে ডানায় ভর করে তিনি কোন রকমেই উপরে উঠতে পারেন না। তাঁর প্লেনটি অতি দ্রুতগামী হওয়া সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে যদি আর বেশী ঊর্ধ্বে উঠতে না পারে, তাহলে তিনি তখন মহাশূন্যে আছেন বলে যুক্তি দেখাতে পারেন। কিন্তু কোথায় যে এরূপ ব্যাপার ঘটবে, সেটা এরোপ্লেনের অনুমিত গতিবেগ প্রভৃতির মত কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু স্থানটি হবে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইলের কাছাকাছি কোন উচ্চতায়; অর্থাৎ বিমান-বিহার বিস্থার ইঞ্জিনিয়ারেব পক্ষে এই উচ্চতা থেকেই মহাশূন্যের আরম্ভ।

এই সকল রেডিও-ইঞ্জিনিয়াব, রকেট-ইঞ্জিনিয়ার ও আকাশ বিহাব-বিস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রত্যেকেই যন্ত্রপাতির দিক থেকে বিসয়টা চিন্তা করেন। কিন্তু কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এই আলোচনায় যোগদান করলে তিনি চিন্তা করেন মানুষের দিক থেকে এবং তখন মহাশূন্য হয়ে যায় অসম্ভব রকম নিকটে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় এক মাইল উপর পর্যন্ত কোন রকম সমস্যা দেখা দেয় না। ডেনভারেব অধিবাসীরা এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবে। দু-মাইল উপরেও তেমন কোন সমস্যা নেই, কেবল একটু অভ্যস্ত হয়ে নিতে হয় মাত্র।

তিন মাইল উচ্চতায়ও বেশ চলে যায়—যদি সে উচ্চতায় আপনি ছোট থেকে বড় হয়ে থাকেন, অথবা সে উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে চলে অভ্যস্থ হবার যথেষ্ট সময় পেয়ে থাকেন। ঐরূপ উচ্চতায় সমতল ভূমির লোকের পক্ষে অবশ্য অতিরিক্ত অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। তবে আবদ্ধ কোঠাঘর বা এরোপ্লেনের কেবিনের মধ্যে অবশ্য প্রয়োজন মত চাপে বাইরের বাতাস ভর্তি করে রেখে স্বচ্ছন্দে থাকা যেতে

পারে। আরও দু-মাইল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাতেই চলতে পারে; এমন কি—পাঁচ মাইল উপরেও যে বাতাস আছে তাতে কোন গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন না হয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। তার অবশ্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে। ঐ উচ্চতায় তাপমাত্রা প্রায়-৪০° ফারেনহাইটের মত; কাজেই তাকে গরম পোষাকব্যবহার করতেই সঙ্গত হবে। এসব ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যেতে পারে।

পাঁচ মাইলের পর আবার আর একটা ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হয়—

জল এবং অন্যান্য পদার্থ, যেগুলি স্বভাবতঃই তরল অবস্থায় থাকে—তাদের স্ফুটনাঙ্ক বাতাসের চাপের উপর নির্ভরশীল। বাতাসের চাপ কমিয়ে দিলে স্ফুটনাঙ্কও কমে যাবে। এমন কি, খুব বেশী উঁচু নয়—এমন কোন পাহাড়ের উপরেও একটা আলু সিদ্ধ করতে বেশ সময় লেগে যায়; কারণ সেখানে জল সহজে গরম হতে চায় না। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে উড়ো-জাহাজের পাইলট হচ্ছেন—অন্যান্য জিনিষের মধ্যে প্রায় ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রক্ষিত তরল পদার্থ-ভর্তি একটি পাত্রের মত। বায়ুর চাপ যখন এতটা কমে যায় যে, ১০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রাতেই জল ফুটতে থাকে, তখন অক্সিজেন মুখোসও আর কোন কাজে আসে না। শরীরের তরল পদার্থ সমূহের তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন না ঘটলেও ফুটন্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসবে সেগুলি—মৃত্যুকে তখন আর ঠেকানো যাবে না। পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যের লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে গেলে যে মৃত্যুর কবলে পড়তে হবে, এই মৃত্যুও ঠিক সেই একই রকমের।

যে উচ্চতায় শরীরের তরল পদার্থ ফুটতে সুরু করবে, সে উচ্চতা হলো বারো মাইল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা একে বলেন—মহাশূন্যের সমপর্যায়ী উচ্চতা, অর্থাৎ মনুষ্য-দেহের পক্ষে যেখান থেকে মহাশূন্য

সুরু হয়। এমন কি, এই উচ্চতায় উপনীত হবার পূর্বেই বায়ু-প্রবেশশূন্য কেবিন ও নিম্ন উচ্চতার সহনশীল পরিবেশ সৃষ্টির সরঞ্জামের সাহায্যে সম্পূর্ণ রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু মানুষ ২০ মাইলেরও বেশী উঁচুতে আকাশে উড়ে বেড়িয়েছে এবং জীব-জন্তুও ৬০ মাইল ঊর্ধ্বে নিরাপদে পরিবাহিত হয়েছে। মনুষ্য-দেহের পক্ষে যেখানে মহাশূন্যের আরম্ভ, তার পরের রক্ষা-ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা সেখান থেকেই যাত্রা সুরু করতে পারি।

মহাকাশ-বিহার তত্ত্ব

বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যেমন আকাশ-বিহার বিদ্যা বা অ্যারোনটিক্স, মহাকাশ সম্পর্কেও তেমনি মহাকাশ-বিহার বিদ্যা বা অ্যাস্ট্রোনটিক্স। মানুষ আজকাল খুব স্বাভাবিকভাবেই বায়ুমণ্ডল, অর্থাৎ আকাশ-পথে বিচরণ করছে এবং একে তারা তেমন একটা গুরুতর কিছু বলে মনে করে না। তাছাড়া সে এখন তার প্রতিনিধিকে দিয়ে মহাকাশ ভ্রমণের কাজ চালাচ্ছে; অর্থাৎ সে এখন তার যান্ত্রিক ভৃত্য—গবেষণা-সংক্রান্ত রকেট ঊর্ধ্বাকাশে পাঠিয়ে প্রথম পথের পত্তন করছে। আরোহীসহ গবেষণা-সংক্রান্ত প্রথম বিমান ১২৬,০০০ ফুট উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছে এবং শীঘ্রই এক্স-১৫ নামক বিমানের সাহায্যে এই উচ্চতা ১০০ মাইল অবধি উঠবে। মহাশূন্য-বিহার বিদ্যা নিশ্চিতই এগিয়ে চলেছে।

তরুণেরা বয়স্কদের চেয়ে অনেকটা আগে অথবা অনেকটা ভাল ভাবে বিষয়টা অনুধাবন করতে পারে। এমন একটা সপ্তাহও বাদ যায় না, যখন আমি এমন একখানা চিঠি না পাই—যাতে লেখা থাকে—

“আমি এখন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হতে যাচ্ছি এবং আমার একটা আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমি মহাকাশ-পরিভ্রমণ-সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করি। এর জন্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আমাকে কি কি পড়তে হবে?”

মাত্র বছর দশেক পূর্বেও এ-রকম প্রশ্নের সন্তোসজনক জবাব দেওয়া কঠিন হতো; কিন্তু এখন সহজেই এ-রকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়।

মহাকাশ-বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রোনটিক্স-এর সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানও বিশেষভাবে জড়িত। লক্ষ্যটা হচ্ছে—মহাশূন্য এবং এই মহাশূন্য হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীর এলাকাভুক্ত। চালকের সাহায্যে যন্ত্রকে মহাশূন্যে চালিয়ে নিতে হবে; কাজেই সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। যন্ত্রের জন্যে যে জ্বালানীর প্রয়োজন, সেটা হলো রাসায়নিকের এলাকা। কাজের হিসাব আগেই করে নেওয়া প্রয়োজন এবং পরে সেগুলিকে মিলিয়ে নিতে হবে। স্বভাবতঃই এগুলি গণিতজ্ঞের কাজ। মোটের উপর সমস্ত বিসয়টাই ফলিত পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা জটিল সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে।

অন্য ভাবে বলতে গেলে, পদার্থ-বিজ্ঞানী, রসায়ন-বিজ্ঞানী, গণিত-বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী—এমন কি, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবেও মহাকাশ-বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায়। যাঁরা যে বিসয়ে শিক্ষা-লাভ করে মহাশূন্য-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন, আর অনুরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত যাঁরা এতে প্রবেশ করেন নি—তাঁদের উভয়ের কাজের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। একথা সত্য যে, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ডাক্তার এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করবার পর বিশেস কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করেন বটে, কিন্তু এজন্যে প্রথমে তাঁকে ডাক্তার হতে হয়। সেরূপ কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে বিশেসজ্ঞ হতে হলে প্রথমে

তাঁকে জ্যোতির্বিদ হতেই হবে এবং জ্বালানী প্রস্তুতকারক রসায়ন-বিদ্‌কে রকেটের জ্বালানী সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধানে প্রবৃত্ত হবার পুর্বে প্রথমে তাঁকে বেশ ভাল সাধারণ রাসায়নিক হতে হবে।

কিন্তু যাঁরা ইতিপূর্বেই মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছু আলাদা রকমের। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পরিকল্পনা স্থির করা, নক্সা প্রস্তুত করা এবং সর্বশেষ রকেট তৈরী করবার জন্যে তিন রকমের ইঞ্জিনিয়ার আছেন। রকেট—সামরিক বিভাগ যার নাম দিয়েছেন 'এয়ারফ্রেম'—সাধারণতঃ আকাশ-বিহার বিদ্যার ইঞ্জিনিয়ারদেরই (Aeronautical Engineers) কাজের ফল। রকেটের শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রাদির কাজ বিশেষজ্ঞদের জন্যেই নির্ধারিত। কিন্তু এসব বিশেষজ্ঞেরা যন্ত্র-বিজ্ঞানের ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্যে কাজ সুরু করেন এবং পরবর্তী বহু বছরের জন্যে তাঁরা একইভাবে কাজ করে যান।

'এয়ারফ্রেম' বা 'প্রোপালসন'-এর কোনটাই নয়, এমন সব জিনিষ-গুলিকে সাধারণভাবে 'গাইড্যান্স' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্দেশক এবং যাঁরা পরীক্ষাদির কাজে ব্যাপৃত, তাঁদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক হলেন ইলেকট্রনিক্স-বিশেষজ্ঞ। কাজেই কোন উদীয়মান গণিতজ্ঞ যদি মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চান, তবে প্রথমে তাঁকে গণিতে পারদর্শী হতেই হবে। তারপর গণিত বিদ্যার কোন ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠতে পারেন। মহাশূন্য-বিজ্ঞানের উদীয়মান ইঞ্জিনিয়ার তাঁর কার্যকালের প্রথম দিকেই বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। কিন্তু তাঁকেও প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার হতে হয়।

ইতিমধ্যেই বৃহত্তর কলেজগুলির পাঠ্যসূচীতে এই বিষয়টি প্রতিফলিত

হয়েছে। রকেট ইঞ্জিনিয়ারিং নামে বিশেষ একটি পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা আছে—যে কেউ এই বিষয়টি অধ্যয়ন করতে পারে। এটা অবশ্য প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যে নয়, শিক্ষা সমাপ্তির পাঠ্যক্রম মাত্র। এটা শেষ করবার পর অধ্যয়নেরও শেষ হয়।

যে যুবক এই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অধ্যয়ন শেষ করে বেরুবে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তাঁকে আর কাজের জন্যে খোঁজাখুজি করতে হবে না, কাজই তাঁকে খুঁজে বেড়াবে।

যে কেউ কি মহাশূন্যের শিক্ষার্থী হতে পারে ?

আপনার ছেলে হয়তো বড় হয়ে মহাকাশে যাবার স্বপ্ন দেখছে। এটা যে কোন প্রশ্ন নয়, একটা বিবৃতি মাত্র তা আমি জানি। কারণ আমাকে যথেষ্ট বক্তৃতা করতে হয় এবং ছেলেদের বাপ-মায়েরা পরে আমার কাছে যে সব সমস্যা নিয়ে আসেন, সেগুলিও আমার অজ্ঞাত নয়। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে প্রধান সমস্যা হলো এই যে, ছেলেরা যখন—'করবো কি ?' 'পারবো কি ?' 'কোথায় ?'—ইত্যাদি প্রশ্ন করে তখন তাদের কি জবাব দিতে হবে, অধিকাংশ বাপ-মায়েরাই তা জানেন না। কাজেই বিচার করে দেখা যাক এখনই এ-সম্বন্ধে কি বলা যেতে পারে।

সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে সহজ বিবেচনার বিষয় হলো—বয়স। এক-আধ ডজন সম্ভাব্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলেও যাদের বয়স এখন আঠারো বা তারও কিছু বেশী, তারা কেউ পাইলট বা ক্রু হিসাবে মহাশূন্যে যেতে পারবে না। তবে বিশ বা ত্রিশ বছর অপেক্ষা করবার পরেও যদি তার মহাশূন্য বিহারের ইচ্ছা বলবৎ

থাকে এবং টিকেটের মূল্য দেবার সামর্থ্য থাকে, তাহলে সে (স্ত্রী কিংবা পুরুষ—যে কেউ হোক) যাত্রী হিসেবে যেতে পারবে; কিন্তু ক্রু সদস্য হিসেবে নয়।

বয়সটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয় হলো কেন—তার সহজ কারণ হলো এই যে, মহাশূন্য জয়ে আরও বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। এখন থেকে কম পক্ষে অন্ততঃ পাঁচ বছর পরে বিশেষ বিবেচনা সহকারে নির্বাচিত কোন পরীক্ষাধীন পাইলট, বায়ুমণ্ডল অতিক্রমে সক্ষম রকেট-যান নিয়ে সর্বপ্রথম পৃথিবীর চারধারে কোন এক কক্ষ পথে গিয়ে হাজির হবে। বারকয়েক এরূপ করবার পর সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের দু-রকম রকেট-যান তৈরীর পন্থা উদ্ভাবিত হবে। এক রকমের রকেট-যান হবে—তথাকথিত 'স্পেস ষ্টেসন', অর্থাৎ মনুষ্য-বাহিত বৃহদাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ। অপরটি হবে পৃথিবীর দূরবর্তী দেশগুলির মধ্যে (যেমন, নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস) যাতায়াতকারী যাত্রীবাহী রকেটের অনুরূপ।

একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এরোপ্লেনের সাহায্যে দু-তিন মাইল উপরে ওঠবার সহজ কৌশল অবলম্বন করে নীচের বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে তিন চতুর্থাংশেরও যাতায়াতের সময় বেশী সংক্ষেপ করা যায়। তথাপিও এরোপ্লেনকে একটা গুরুতর বাধার সম্মুখীন হতে হয়—সেটা হচ্ছে বাতাসের বাধা। যেহেতু চলবার সময় রকেটকে বাতাসের উপর নির্ভর করতে হয় না, সেহেতু রকেট-যানকে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে তুলে দিলে অনায়াসেই এই শেষ বাধা অতিক্রম করা যেতে পারে। কাজেই নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে যেতে হলে মহাকাশের এই বায়ুশূন্য স্থানই হবে সবচেয়ে দ্রুতগমনোপযোগী পথ। বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠে রকেট-যান এই দূরত্ব প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাড়ি দিতে পারবে।

ইতিপূর্বে আমি যখন বলেছিলাম, এখন থেকে বিশ-ত্রিশ বছর পরে অথবা তারও আগে যাত্রী হিসেবে যে কেউ সত্যসত্যই এ-কাজ করতে পারবে, তখন এই ধরণের শূন্যপথে যাত্রার কথাই আমার মনে হয়েছিল।

কিন্তু কোন একটি ছেলের বয়স যদি এখন দশ বছর বা আরও কম হয়, তবে চাঁদের চতুর্দিক অনুসন্ধানে যাত্রা বা মঙ্গলগ্রহ অভিযানের মত 'প্রকৃত মহাশূন্য পরিভ্রমণে'র কথা সে ভাবতে পারে। যদি সে অন্য ভাবে শিক্ষালাভ করে থাকে তবে এ-কাজ কি করতে পারবে? হয়তো পারবে বা পারবে না। এটা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার এবং কত তাড়াতাড়ি অবস্থা পরিণতি লাভ করে—তার উপরই নির্ভর করবে। আমি মনে করি না যে, আমার হিসাব অপরিবর্তনীয়। আমি একথাও জানি, অতীতে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তাদের কি পরিণতি ঘটেছিল। টমাস জেফারসন লুসিয়ানা ক্রয়ের কথা ঘোষণা করবার সময় বলেছিলেন যে, তিনি আশা করেন, ২৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই জায়গাটিতে পুরাপুরি বসতি স্থাপিত হতে পারে।

ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা নিশ্চিতভাবে আমরা এখন বলতে পারি না; তবে চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞেরা বিচার-বিবেচনা করে আগে থেকেই যা স্থির করেছেন, তদনুসারে মহাশূন্য-যাত্রাব পাইলট কি ধরণের হবে তা আমরা বলতে পারি। পাইলটের দৈহিক আকৃতি, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা এবং হজম শক্তি বেশ ভাল হওয়া দরকার। তার দৃষ্টিশক্তি ভাল হওয়া চাই ২০।২০। বেশী লম্বা হলে চলবে না—দেহের উচ্চতা সর্বাধিক ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির মধ্যে থাকা দরকার। দেহের স্থূলতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেলে সে অনুপযুক্ত বলে গণ্য হবে। শরীরের ওজন কমের দিকে থাকলে চিকিৎসাবিদ পরীক্ষকেরা তাকে হয়তো পছন্দই করবেন। শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই

তার দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা থাকা দরকার। আবেগের দিক থেকে তার মানসিক সাম্য থাকা চাই। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত মহাশূন্যের ক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম রহস্যানুভূতির ক্ষমতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া বেশ কল্পনাশক্তি থাকাও দরকার।

কিন্তু প্রথমে যখন সে সাধরণ চালক হিসাবে, তারপর সহযোগী পাইলট হিসাবে এবং সর্বশেষ কর্ণধার (ক্যাপ্টেন) হিসাবে কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ লাভ করে, তখন আর সে যুবক থাকে না। এত বিষয় তাকে জানতে হবে এবং এত দক্ষতা তাকে অর্জন করতে হবে, যে সব বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে তার অনেক বছর কেটে যাবে। দৈহিক উৎকর্ষের চেয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। সে যখন কন্ট্রোল রুমে আসন গ্রহণ করবে তখন হয়তো তার বয়স হয়ে যাবে আটাশ বছর।

মহাশূন্যে যাত্রা সম্পর্কে কোন ছেলে যদি প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে, তবে এখনকার মত এই কথাগুলিই তাকে বলা যেতে পারে এবং যখন কোন ছোট্ট মেয়ে এসে জানতে চাইবে—মেয়েরা পারবে না কেন ? তখন উত্তর হবে—সম্ভবতঃ এক মাত্র প্রচলিত প্রথা ছাড়া মেয়েদের না পারবার কোন কারণ নেই।

শব্দ ও তাপীয় প্রতিবন্ধকতা

আকাশে ওড়বার ব্যাপারে উৎসাহী যে কোন তরুণকে জিজ্ঞেস করলেই সে বলবে—শব্দের প্রতিবন্ধকতা তো সম্পূর্ণরূপেই দূরীভূত হয়েছে ; কিন্তু উচ্চ গতির উড্ডয়নের ব্যাপারে পরবর্তী সমস্যা হলো —উত্তাপের প্রতিবন্ধকতা। দুঃখের বিষয় এই কথাটাকে—যা বার বার ঠিক একইভাবে মুদ্রিত হয়েছে—এত বেশী সহজ করে দেখানো

হয়েছে যে, একে এখন আর নির্ভুল বলা চলে না। শব্দের প্রতিবন্ধকতাকে আকাশে একটা ইটের দেয়ালের মত দৈহিক শক্তি-প্রয়োগে ভাঙবার প্রয়োজন হয় না এবং উত্তাপের বাধাও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বাধা নয়, সেটা অন্য কিছু। অনেক সময় আমাকে বলা হয়েছে—কিন্তু, আমি জেট-ফাইটার বিমান-ঘাঁটির খুব নিকটেই বাস করি এবং তারা যে শব্দের বাধা ভেঙে ছুটে যায়, সেটাও আমি শুনতে পাই।'

এ-কথার জবাব দেবার পূর্বে প্রকৃত পক্ষে শব্দের বাধা বস্তুটা কি রকম—সে বিষয়ে খুব সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক। সমুদ্র-পৃষ্ঠের সমতলে শব্দের গতি হলো ঘণ্টায় প্রায় ৭৬৫ মাইল। এর চেয়ে যা দ্রুততর গতিতে চলে, তাকে বলা হয় সুপারসনিক বা শ্রুতিপারের শব্দ। যার গতি এর চেয়ে মন্থর, তাকে বলা হয় সাবসনিক। কোন এরোপ্লেন যদি শব্দ-গতির অর্ধেক গতিতে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে এরোপ্লেনের ডানার উপরে এবং নীচে বায়ু-প্রবাহের প্যাটার্নকিরণ হয়, তা ভাল রকমেই জানা আছে। এরোপ্লেনটি যদি শব্দের গতির দেড় গুণ বেগে ছুটতে থাকে, তাহলে তার ডানা ও লেজের চতুর্দিকে বাতাস প্রবাহিত হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্যাটার্ণে। এই প্যাটার্ণটা যে কি এবং কেমন করে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে, বিশেষজ্ঞেরা সেটা ভালরকমেই জানেন। কিন্তু এরোপ্লেনের গতি যদি শব্দের গতির খুব কাছাকাছি হয়, তাহলে বায়ু-প্রবাহের ওই দু-রকমের প্যাটার্ণই একসঙ্গে পাওয়া যাবে এবং সেটাই হলো আসল অসুবিধা। ডানার উপরের দিকে বায়ু-প্রবাহের সুপারসনিক প্যাটার্ণ এবং নীচের দিকে সাবসনিক প্যাটার্ণ নিয়ে কোন প্লেনকে সামলাবার আশা করা যায় না। কাজেই শব্দগতি পরিত্যাগ করতে হবে; হয় শব্দের গতির চেয়ে দ্রুততর চলতে

হবে, নয় তো তার চেয়ে গতি অনেকটা মন্থর করতে হবে। যদি এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় যেতে হয়, তবে সেটা যত দ্রুত-গতিতে করা যায় ততই সুবিধা।

তাছাড়া আর একটি অতিরিক্ত জটিলতা হলো এই যে, শব্দের গতি সব জায়গায় সমান নয়। আট মাইল উঁচুতে হয়তো শব্দের গতি হবে ঘণ্টায় আট মাইল। বায়ুর তাপমাত্রার উপর শব্দের গতি নির্ভর করে। ঠাণ্ডা বাতাসে শব্দের গতি অনেকটা মন্থর হয়ে যায়। যতই উপরে ওঠা যায়, বাতাস ততই ঠাণ্ডা; তাছাড়া উপরের দিকে বাতাস ক্রমশঃই বিরল হতে থাকে। অবশ্য একমাত্র তাপমাত্রা ছাড়া বাতাসের ঘনত্বের কম-বেশীতে কিছু যায় আসে না।

এখন কথা হলো—যে ভীষণ শব্দ শোনা যায়, সে ব্যাপারটা কি? খুবই সহজ। শব্দের গতির চেয়ে নিম্ন-গতির কোন প্লেন যদি আপনার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তবে শুনবেন, তার শব্দ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্লেনটা আপনার মাথার উপর এসে গেলে সবচেয়ে বেশী জোরে শব্দ শুনতে পাবেন। কিন্তু প্লেনটা যদি তার নিজের শব্দের গতির মত দ্রুতগতিতে চলে, তাহলে যে শব্দ উৎপন্ন হবে (তা যে কোন দিকেই হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না), সেগুলি একসঙ্গে এসে আপনার কর্ণপটহে আঘাত করবে। প্লেনের গতিবেগ শব্দের গতির চেয়ে সামান্য কিছু কম থাকলেও একই রকমের ফল হবে; নির্দিষ্ট গতিবেগ থেকে পরিবর্তনের সময়ের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

তথাকথিত 'উত্তাপের বাধা' হচ্ছে একটি পৃথক সমস্যা। প্রকৃত-পক্ষে এটা কোন বাধাই নয়; কারণ গতি বা উচ্চতার এমন কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, যাকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্লেন একবার উত্তপ্ত হতে সুরু করলে যত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকবে, অবস্থা ততই ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকবে। এই কারণেই আকাশচারীরা এই ব্যাপারটাকে 'উত্তাপের বাধা' বলে অভিহিত করবার প্রস্তাব করেছেন।

হিসাব করে দেখা গেছে—একখানা এরোপ্লেন সমুদ্র-পৃষ্ঠের সমতলে ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে উড়ে গেলে শুধু বাতাসের ঘর্ষণে ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হবে; অর্থাৎ বাতাসের যে উষ্ণতা আছে, তারচেয়ে ১০০° ডিগ্রি বেশী। এর সঙ্গে সূর্যকিরণের তাপ, ইঞ্জিনের তাপ প্রভৃতি যোগ করলে দেখা যাবে যে, এই উত্তাপে প্লেনটির মধ্যে যে কেবল অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টিহবে তা-ই নয় অধিকন্তু প্লেনটিও দুর্বল হয়ে পড়বে।

এই হারে সাত মাইল উঁচুতে উঠলে অবশ্য অনেকটা ভালই বোধ হবে! ওই উচ্চতায় চতুর্দিকের বাতাসের তাপমাত্রা প্রায় ১০০° ডিগ্রি কম হবে এবং সেখানকার বায়ুস্তর হাল্কা হওয়ার ফলে ঘর্ষণও কম হবে (পক্ষান্তরে সূর্য-কিরণের প্রখরতাও সেখানে বেশী হবে)। অধিক উচ্চতায় ঘর্ষণজনিত উত্তাপের বাধা কম হবে বটে, কিন্তু গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্রই হোক, কি বিলম্বেই হোক, আবার এর বৃদ্ধি দেখা যাবে।

এর প্রতিকারের ব্যবস্থা এখনও উদ্ভাবিত হয় নি। বিশেষতঃ সামরিক বিমানের বিষয় চিন্তা করলে দেখা যায়, তাদের প্রচণ্ডতম গতিবেগে যে কোন উচ্চতায় উঠে কাজ করবার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। অসামরিক পরিবহন ব্যবস্থায় এর একটি সহজ উত্তর আছে। যদি তারা ১২৫,০০০ ফুটের উপরে উঠতে পারে, তবে অতি উচ্চ গতিবেগে ছুটলেও ঘর্ষণোদ্ভুত উত্তাপের জন্যে তাদের ততটা বিব্রত হতে হবে না। কারণ, ১২৫,০০০ ফুট ঊর্ধ্বে বাতাস

এতই বিরল যে, শব্দগতির দ্বিগুণ বেগে ছুটলেও উত্তাপের মাত্রা এমন সীমার মধ্যে থাকবে, যা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হবে না।

ভারশূন্য উড্ডয়ন

কিছুকাল যাবৎ এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী, (যাঁদের কাজ হচ্ছে, সম্মুখের দিকে নজর রাখা এবং আগামী বছর বা তার পরবর্তী বছরে উত্থাপিত হবার সম্ভাবনা আছে প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখা) এরূপ একটা সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। মানুষ যখন প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে, তারপর সামরিক প্রযোজনে এবং তার কিছু পরেই ব্যক্তিগত ভাবে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে রকেট উড্ডয়নে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাদের হয়তো নতুন নতুন কতকগুলি উত্তেজনামূলক অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

বিজ্ঞানীদের একথা জানা ছিল যে, মানুষ ভূমি ছেড়ে উপরে ওঠবার সময় এমন একটা প্রচণ্ড রকমের বর্ধিত গতিবেগের প্রভাবাধীন হবে, যার ফলে সে অনুভব করবে, তার ওজন যেন প্রকৃত ওজনের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেছে। অল্প সময়ের জন্যে ঊর্ধ্বারোহণের এই গতিবৃদ্ধির অনুভূতির পর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্যে বিপরীত অনুভূতি হবে। রকেট-যাত্রীর তখন মনে হবে, তার যেন কিছুমাত্র ওজন নেই। একে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পাবে যে, অতি উচ্চ মাত্রায় গতিবৃদ্ধি হলে, সেটা শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। আবার এই যুক্তিও দেখানো যেতে পাবে যে, আপাত-প্রতীয়মান ওজন-শূন্যতার অবস্থা শারীরিক কোন ক্ষতির কারণ হবে না। প্রশ্ন ছিল—এইরকম অভিজ্ঞতার ফলে পাইলট কতটাবিভ্রান্ত (বিজ্ঞানীরা বলেন—দিগভ্রান্ত) হতে পারে।

অতি উচ্চ গতিবৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কে বলা যায় যে, বৃহদাকৃতির সেন্টি-ফিউজের সাহায্যে খুব সহজেই তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এবং শীঘ্রই জানা গেল—সাধারণতঃ যেরূপ মনে করা হতো, মনুষ্য-দেহ তার চেয়ে অনেক বেশী সহনশীল। কিন্তু ভারশূন্য অবস্থা, (অর্থাৎ শূন্য-মাধ্যাকর্ষণের অবস্থা) বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন—Zero-g Condition পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ইচ্ছামত এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।

এখানে একথা বলা দরকার যে, ভারশূন্যতা অনুভব করবার জন্যে পৃথিবী ছেড়ে বহু দূরে যেতে হবে না; কারণ মনুষ্য-শরীর কোন রকমেই মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করতে পারে না। শরীর যা অনুভব করে, সেটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। শরীর এটুকু মাত্র অনুভব করে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান অনুসরণে সে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। যে চেয়ারের উপর আপনি বসে আছেন, সে আপনার দেহের ভার বহন করছে; ঘরের মেঝে চেয়ারটাকে বহন করছে এবং ভূমি মেঝেকে বহন করছে। এরা সবাই মিলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান অনুসরণে আপনাকে বাধা দিচ্ছে এবং আপনি যা অনুভব করেন, সেটা হলো—এই প্রতিবন্ধকতা। আপনার দেহটা যদি বিনা বাধায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এই টান অনুসরণ করতে পারতো, তাহলে দেহটা ঠিক মত কোন কিছুই অনুভব করতো না। অনুভব করতো শুধু ভারশূন্যতা। কোন একটা আবদ্ধ কেবিনের মধ্যে থেকে আপনি যদি অবাধে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান অনুসরণ করতে থাকেন, তখন কিন্তু আপনার পতনের অনুভূতি না হয়ে অনেকটা ভেসে থাকবার মত অনুভূতি হবে; ঠিক একেবারে ভাসমান অবস্থার মত নয়—এই অনুভূতিকে প্রকাশ করবার মত কোন শব্দ এখনও তৈরী হয় নি।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু যুক্তিতর্কেই সন্তুষ্ট রইলেন না, তাঁরা কিছু পরীক্ষা চালাবার মতলব করলেন। ছোট্ট একটি রকেটের বায়ু-রুদ্ধ কেবিনের মধ্যে দুটি বানরকে পঞ্চাশ মাইল উর্ধ্বে প্রেরণ করা হলো। যাত্রাপথে বানর দুটি কয়েক মিনিট কাল ভারশূন্য অবস্থায় ছিল। কেবিন থেকে বের করে আনবার পর তাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এটা একটা সুলক্ষণ। উড্ডয়নের সময় তাদের হৃদযন্ত্রের যে ইলেক্ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম গৃহীত হয়েছিল, তার সঙ্গে অপর দুটি কার্ডিয়োগ্রামের মধ্যে একটি আগের দিন এবং অপরটি পরের দিনে নেওয়া হয়েছিল—কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। কিন্তু বানর তো ইংরেজী ভাষায় কথা বলে না; কাজেই তাদের অনুভূতি কি রকম হয়েছিল, তা সে বলতে পারেনি।

তারপরে এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হলো, যার দ্বারা মানুষ নিরাপদে ভারশূন্য অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে। সেটা হলো জেট-ট্রেনারের সাহায্যে একরকম সহজ ও নিরাপদ উড্ডয়ন কৌশল—যাতে অন্ততঃ আধ মিনিটের জন্যে নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিতরূপে আপাত ভারশূন্যতা উৎপাদন করা যেতে পারে। একজন পাইলট এ বিষয়টি পরীক্ষা করতে গিয়ে অপূর্ব বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, কেবিনের মেঝের উপর থেকে একটা পেন্সিল তার চোখের সামনেই উপরে উঠে গিয়ে শূন্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু ব্যাপারটা তার মোটেই ভাল বোধ হয় নি এবং প্রায় পনেরো সেকেণ্ড পরেই পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এতে স্বভাবতঃই কতকগুলি চিন্তার উদ্রেক হয়। ভারহীনতা কি সত্যই অসহনীয় হয়েছিল? অথবা এটা কি সমুদ্র-পীড়ার মত কোন একটা ব্যাপার? জাহাজ নোঙ্গর করা থাকলেও কোন কোন লোক সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে; অথচ অন্য লোকেরা

মোটেই আক্রান্ত হয় না! দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা কি তবে এমন একজন লোককেই পরীক্ষার জন্যে বেছে নিয়েছিলেন, যে হয়তো বিশেষ রকম অনুভূতিপ্রবণ ছিল? এক্ষেত্রে এইরকম ফল তারা পেয়েছেন বলে আশা করা ও অন্য লোকদের নিয়ে পরীক্ষা করা ছাড়া তারা আর কি করতে পারেন।

এখন পরীক্ষার ফল যা পাওয়া গেছে, তা হলো এই—অল্প সংখ্যক লোক বলেছে যে, ভারশূন্য অবস্থাটা অপ্রীতিকর, বমনোদ্রেককারী ইত্যাদি এবং তারা এতে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক; অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক লোক বলেছে যে, ভারশূন্য অবস্থাটাকে তারা কিছুই মনে করে না। আর একদল লোক এই অবস্থাটাকে আনন্দদায়ক উৎসাহবর্ধক এবং মোটের উপর আশ্চর্যজনক বলে মনে করেছে। আর অল্প কয়েকজন বলেছে যে, তারা থাকতে পারে নি বলেই সরে এসেছে; যদি পারতো তবে অনির্দিষ্ট কাল পরীক্ষা চালিয়ে যেতো।

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধক পর্দা নয় কেন?

নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে, ধরুন প্রায় দুমাস অন্তর, আমি একটা করে চিঠি পাই, যাতে কৃত্রিম উপগ্রহও মহাশূন্য যাত্রা পরিকল্পনা রচনাকারী লোকদের যুক্তির অভাবে পত্র লেখক বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেন না। পত্রে বলা হয় নক্সা প্রস্তুতে এবং সেকেণ্ডে ৪০০ পাউণ্ড জ্বালানী পোড়াতে পারে এরূপ রকেট-ইঞ্জিন নির্মাণ করবার জন্যে ইঞ্জিনিয়াররা এগিয়ে আসেন এবং কোম্পানী অথবা করদাতাদের লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে ফেলেন। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কেমন করে প্রতিরোধ করা যায়, তার কোন

উপায় উদ্ভাবনের জন্যে তাঁরা কেন তাঁদের সময় ও অর্থ ব্যয় করেন না? একবার যদি তাঁরা সেটা জানতে পারেন তাহলে সব কিছুই অনেক সহজ হয়ে যাবে নাকি? বিরাট আকৃতির রকেট-মোটর নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধক 'পর্দা' উদ্ভাবনের চেষ্টা করুন না কেন? রকেট-মোটরের সাহায্যে তখন কেবল পরিচালনের ব্যবস্থা করলেই চলবে।

প্রসঙ্গত আমি দুটি কারণের কথা বলতে পারি—উভয় যুক্তিই আমার বেশ সঙ্গত বলেই মনে হয়। প্রথমটি হলো এই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রতিরোধী পর্দা কেমন করে তৈরী করতে হয়, তা কেউ জানে না। দ্বিতীয় যুক্তিটা হলো—কেমন করে এই রকমের একটা জিনিস আবিষ্কারের জন্যে চেষ্টা করতে হবে, তাও কারোর জানা নেই। এ-রকমের কিছু করতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে—প্রকৃত পক্ষে আকর্ষণ শক্তি জিনিসটা কি? আমরা জানি না—আমরা যা জানি—তা খুবই সামান্য—একথা বললে অবস্থাটা আরও খারাপই হয়ে যাবে। এই সামান্য জানা থেকেই স্বীকার করতে হয় যে, মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধী কোন পর্দার অস্তিত্ব সম্ভব নয় এমন কি, তত্ত্বগতভাবেও নয়।

সম্প্রতি একজন ইটালীয় বিজ্ঞানীক লিখেছেন যে, শিল্পের উপর পারমাণবিক শক্তির প্রভুত্ব বিস্তারে মাত্র বছর দশেক সময় লেগেছিল। একথা অবশ্য সত্য; কিন্তু পনেরো বছর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, এক রকমের ইউরেনিয়াম পরমাণু কোন কোন অবস্থায়—যা তখনও ছিল অনুসন্ধানের বিষয়ে—দ্বিধা বিভক্ত হয়ে শক্তি বিকিরণ করে। অন্য কথায় বলতে গেলে পরমাণু-গবেষকেরা একটি প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাহায্য পেয়েছিলেন। সেই তথ্যটি হলো—এক রকমের পরমাণু দ্বিধা বিভক্ত হয়। মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রেও

যদি এরূপ কোন তথ্যের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে সেটা যে কেবল জনসাধারণেরই অজ্ঞাত—তা নয়, পদার্থতত্ত্ববিদ্‌দের কাছেও সুগুপ্ত রয়েছে।

মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে আমরা যা জানি সেটা হলো এই যে, এই শক্তি দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে কমতে থাকে। যাকে বলা হয় ব্যস্ত আনুপাতিক এর অর্থই হলো এই যে, দূরত্ব দ্বিগুণ হলে মাধ্যাকর্ষণের টান হবে প্রথম যাত্রা সুরু করবার স্থানে যা ছিল, তার এক চতুর্থাংশ মাত্র। দূরত্ব তিন গুণ হলে এই টান হবে মাত্র নয় ভাগের এক ভাগ। দূরত্ব চতুর্গুণ বাড়লে টান হবে মাত্র ষোল ভাগের এক ভাগ এবং এই হারেই চলবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে, এই তথ্যের মধ্যেই সংকেত লুকানো থাকতে পারে, তবে তাঁকে হতাশই হতে হবে। এই নিয়ম আলো এবং শব্দের ব্যাপারেও প্রযোজ্য এবং এর একটা সরল গাণিতিক ব্যাখ্যাও আছে। আমরা এর বেশী কিছু জানি না—যদি না আমরা মনে করি যে—আলো, অন্ধকার, উত্তাপ, এক্স-রে, বিদ্যুৎ অথবা অন্য যা কিছু মানুষ চিন্তা করতে পারে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পরিবর্তিত বা প্রভাবান্বিত হয় না।

প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডের একজন বিজ্ঞানী এক কৌতুহলোদ্দীপক ধারণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—যদি ধরা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় পূর্ণ এবং সেগুলি সব কিছুকেই ভেদ করে যেতে পারে এবং অতি উচ্চ গতিতে চলা ফেরা করে—তবে দেখা যাবে—এই কণিকাগুলির দ্বারা সৃষ্ট চাপের ফলেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উদ্ভব হয়। তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হলো এই যে—ধরুন, কোন জমিতে একখণ্ড পাথর পড়ে আছে এবং কণিকাগুলি উপর থেকে পূর্ণ বেগে ছুটে এসে পাথরখানাকে

আঘাত করছে। যে সব কণিকা পৃথিবী ভেদ করে চলে গেছে, সেগুলিও নিচের দিক থেকে পাথরখানাকে আঘাত করছে। কিন্তু যেসব কণিকা পৃথিবী ভেদ করে গেছে, ভেদ করবার সময় তাদের গতিবেগ কিছুটা কমে যাবার কথা। কাজেই নিচের দিকের চাপের চেয়ে উপরের দিকের চাপ নিশ্চয়ই কিছুটা প্রবলতর হবে। এই পার্থক্যকেই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ।

এটা নিশ্চয়ই একটা সহজ ধারণা; কারণ বহুবার এটা অন্যান্য লোকের দ্বারাও প্রচারিত হয়েছে, যাদের কেউ কোন দিন জেনেভার অধ্যাপক লি সেজের নাম পর্যন্ত শোনেন নি এবং এটা যে তাঁরা সম্পূর্ণ নিজে নিজেই চিন্তা করে বের করেছেন—একথা তাঁরা শপথ করে বলতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সহজ হোক বা না হোক, এটা কোন কাজেই আসে না। মাধ্যাকর্ষণের এই ব্যাখ্যাই যদি ঠিক হতো তবে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে যে, বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি যে ভাবে ঘুরছে, ঠিক সেভাবে ঘুরতো না।

কাজেই, প্রকৃত প্রস্তাবে মাধ্যাকর্ষণটা যে কি, তার কোনই ব্যাখ্যা নেই। নিয়মের কোন ব্যতিক্রম থাকলে সেটা যেমন মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি জানবার পক্ষে সহায়ক হতো, সে রকমের কোন ব্যতিক্রমের কথাও জানা নেই। মাধ্যাকর্ষণ কি—তা যতদিন পর্যন্ত না জানা যায়, ততদিন তার সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে তা আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারি না। একদিন হয়তো সেটা জানা যাবে। মাধ্যাকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে বড় বড় রকেট তৈরী করে আমরা অনেক অদ্ভুত কাজ করতে পারি।

কে প্রথম রকেট উড্ডয়ন করেন ?

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডন (ইংল্যাণ্ড) থেকে প্রকাশিত একখানি অখ্যাতনামা সাপ্তাহিক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সে সময়কার এক বিস্ময়কর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি ছিল এরূপ—সপ্তাহখানেকের কম সময় পূর্বে জার্মানীতে আরোহী সমেত সর্ব প্রথম রকেট উড্ডয়ন করা হয়েছে। ঘটনাটি হয়েছিল ১৯৩৩ সালের ২৯শে অক্টোবরে। যেখান থেকে রকেটটিকে আকাশে প্রেরণ করা হয়, সেটি হলো বাল্টিক সাগরের রুয়েজেন দ্বীপের একটা নির্জন জায়গা। জার্মান সেনাবাহিনী ছিল এই ব্যাপারের উদ্যোক্তা। রকেটের পাইলটের নাম হলো অটো ফিসার এবং রকেটটির পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর ভাই ব্রুনো ফিসার। রকেটটি প্রায় ৬ মাইলেব কাছাকাছি উঁচুতে উঠেছিল।

খবরটি এ-পর্যন্ত বেশ বিশ্বাসযোগ্যই ছিল ; কিন্তু তারপরে যেখানে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তার গতিবেগ হোঁচট্ খেয়েছে। বলা হয়েছে, ২৪ ফুট লম্বা রকেটটি প্রাথমিক বিস্ফোরণের সাহায্যে ২০০ গজ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। তারপর একটা আলোর ঝল্‌কানি সামিল নিমেষে সেটা দর্শকদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আজকাল এমন লোক খুব কমই আছে, যারা অন্ততঃ টেলিভিসন বা সিনেমার পর্দায় বড় বড় রকেটের সাড়ম্বর উৎক্ষেপণের দৃশ্য দেখে নি। তাদের কাছে এ বিবরণ ভ্রান্তিমূলক বলেই প্রতীয়মান হবে। কিন্তু তখনকার দিনে কেউ একথা ভুল বলে মনে করেনি। তখনকার দিনে রকেটের কথা শুনে থাকলেও অধিকাংশ লোকেরই রকেট সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

কাজেই উক্ত বর্ণনায় যদিও বলা হয়েছিল যে রকেটটা আকাশে একটা আলোর ঝলকের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল—সে কথা বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না।

তা সত্ত্বেও সংবাদের শেষের অংশটুকু পাঠকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে থাকবে। কারণ তাতে বলা হয়েছিল—প্রায় মিনিট দশেক পরে রকেটটা আবার দৃষ্টিপথে আসে এবং সে সময়ে সেটা মাথার দিক নিচে রেখে মস্তবড় একটা প্যারাসুটের সঙ্গে ঝুলছিল। দর্শকেরা তারপর দেখলো—রকেটের ইস্পাত নির্মিত পাখনাগুলি ঘুরছে, অটো ফিসার ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ করছেন যাতে সেটা সমুদ্রে না পড়ে দ্বীপের উপরেই অবতরণ করতে পারে। রকেটটা যদি প্যারাসুটের সঙ্গে ঝুলেই থাকে তাহলে লেজের পাখনা ঘুরলেও তার পক্ষে ঠিক মত কোন কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ পাখনাগুলি যত খুসী ঘুরে থাকতে পারে, কিন্তু প্যারাসুটের গতিবিধির উপর মোটেই কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

সমস্ত ব্যাপারটাই অবশ্য একটা ধাপ্পা মাত্র। কিন্তু ধাপ্পা হলেও সেটা লোকের মনে একটা স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। বিবরণটা পুনর্মুদ্রিত হয়ে জার্মানী সমেত পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে শত শত চিঠিপত্র লেখা হয়েছিল এবং তার বেশীর ভাগই আমার ডেস্কের উপর এসে জমা হয়। কারণ সেই সময়ে আমি ছিলাম (জার্মান) মহাশূন্য পরিভ্রমণ সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সেহেতু পত্র-লেখকেরা স্বভাবতঃই ধরে নিয়েছিলেন যে এ বিষয়ে সব খবরই আমার জানা আছে। সত্যই যদি এরূপ একটা রকেটের অস্তিত্ব থাকতো এবং তার ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণের এরকম একটা ব্যাপার ঘটতো—এমন কি, ফিসার ভ্রাতৃযুগলের মত কোন লোকেরও অস্তিত্ব থাকতো, তাহলে সে সব কিছু খবরই আমার জানবার

কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র জিনিস, যার সত্যই অস্তিত্ব ছিল—সেটা হচ্ছে রুয়েজেন দ্বীপ।

আচ্ছা, ১৯৩৩ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে রুয়েজেন দ্বীপ থেকে রকেট উড্ডয়নের খবরটা যদি মিথ্যাই হ'য়ে থাকে, তবে রকেটে চড়ে সর্বপ্রথম আকাশযাত্রা করেছিল কে ?

এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম কৃতিত্বের অধিকারী কে, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে। কে কতটা কি করেছিল এবং কখন করেছিল—সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার দরুণ মতভেদ নয়, মতভেদটা একটা প্রশ্ন হিসেবে দাঁড়ায় এই যে, 'রকেট উড্ডয়ন' কথাটার দ্বারা যথার্থ কি বুঝায় ?

১৯২৮ সালের ১১ই জুন, ষ্ট্যামার নামে একজন পাইলট পশ্চিম জার্মানীর রোয়েল পর্বত থেকে যেভাবে আকাশে উড়েছিলেন তাকে রকেট উড্ডয়ন বলা যেতে পারে। এতে একটা হংসাকৃতি গ্লাইডার 'প্লেন ব্যবহৃত হয়েছিল। তখনকার দিনে প্রচলিত রাবারের দড়ির সাহায্যে সেটাকে আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে প্রজ্বলনশীল কালো বারুদ ভর্তি দুটি রকেটে পর পর অগ্নিসংযোগ করা হয়। পাইলট প্রথমে সামনের দিকে সোজা ২০০ গজ উড়ে যায়। তারপর ডানদিকে মোড় নিয়ে আরও ৩০০ গজ অগ্রসর হয়। তাবপর আবার ডানদিকে ঘুরে আরও ৫০০ গজ সোজা উড়ে যাবার পর ভূমিতে অবতরণ করে। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় মাত্র দু-সেকেণ্ড জ্বলবার পরেই রকেটে বিস্ফোরণ ঘটে এবং গ্লাইডারে আগুন ধরে যায়। কিন্তু ষ্ট্যামার নিরাপদে অবতরণ করতে সক্ষম হন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ষ্ট্যামারেব উড্ডয়নকেই প্রথম বলা যায়; কিন্তু দুটি কারণে একে ঠিক রকেট উড্ডয়ন বলা চলে না। প্রথম কারণ হলো—প্রথমত এটি ভিন্ন উপায়ে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ

প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা ছিল একটা গ্লাইডার এবং তাকে গতিশীল করবার জন্যে রকেট জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই দুটি আপত্তির একটিকে দূরীভূত করে ১৯২৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ক্রিজ ভন ওপেল রকেট-চালিত গ্লাইডার তৈরী করেন। এই গ্লাইডার নিজের রকেটের শক্তিতেই ভূমি থেকে উপরে উঠেছিল। কিন্তু আকাশে উড্ডয়নের পর এতেও আগুন ধরে যায়, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আগুনটা ধরেছিল যাত্রা শেষ হবার মুখে। এর পাইলট অক্ষতদেহে জীবন্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন; কিন্তু গ্লাইডারটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

সত্যিকারের প্রথম রকেট আকাশে উঠিয়েছিলেন জার্মাণ বিমান বাহিনীর একজন অজ্ঞাতনামা পাইলট, ১৯৪৪ সালের অক্টোবর কিংবা নভেম্বর মাসে। অন্য কোন বিস্ফোরকের সাহায্য না নিয়ে এই রকেট নিজস্ব শক্তিতেই খাড়াভাবে উপরে উঠেছিল। আলোচ্য যন্ত্রটা 'মনুষ্যবাহিত ক্ষেপণাস্ত্র' ছাড়া আর কিছুই নয়। এর নাম দেওয়া হয়েছিল—'ন্যাটার', বিষধর সর্পের জার্মান প্রতিশব্দ। পুরু ডানাওয়ালা ক্ষেপণাস্ত্রটা ঠিক মতই উপরে উঠে গেল; কিন্তু প্রায় ৫০০ ফুট উপরে ওঠবার পর ককপিটের (বসবার জায়গার) ঢাক্‌নাটা খুলে পড়ে গেল, পাইলটের মাথা রাখবার স্থানটা ঢাক্‌নার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল বলে তার ঘাড়টা সম্ভবতঃ তন্মুহূর্তেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। ক্ষেপণাস্ত্রটা আরও ৫০০০ ফুট উপরে ওঠবার পর ঘুরে গেল এবং মাটিতে এসে উল্‌টে পড়লো।

যিনি প্রথম সত্যিকার রকেট উড্ডয়ন করেছিলেন, সেই প্রথম মানুষটি জীবন্ত ফিরে আসতে পারেন নি। কিন্তু এর কয়েক বছর পরে ১৯৪৭ সালের ১৪ই অক্টোবর মার্কিন বিমান বাহিনীর মেজর চার্লস্ ই. ইয়েগার সর্বপ্রথম একখানি রকেট-চালিত গবেষণা

প্লেনকে শব্দের চেয়ে দ্রুততর গতিতে চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে আর একটি কথা বলা যেতে পারে যে, মেজর ইয়েগার এখনও বেশ সুস্থ সবল আছেন।

শব্দগতির চেয়ে দ্রুতগামী লাফানো বিমান
(হাইপারসনিক লাফানো বিমান)

মাত্র আড়াই ঘণ্টায় পৃথিবীর চতুর্দিকের অর্ধেক পথ অতিক্রমে সক্ষম রকেট-চালিত বোমারু বিমান তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছে এই ধরণের কথায় অল্প কিছুদিন পূর্বেও কেউ বড় একটা বিশ্বাস করতে চাইতো না। প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে স্পুটনিক ও এক্সপ্লোরারের পৃথিবীর চতুর্দিকের অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করবার পর পূর্বোক্ত গতিকে প্রায় মন্থর বলেই মনে হয়। কিন্তু উক্ত পরিকল্পনা বায়ুমণ্ডলের বাইরে ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণশীল কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে নয়; ওই পরিকল্পনা হলো বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বিচরণশীল মনুষ্য-চালিত বোমারু বিমান সম্পর্কে।

কিছু কিছু আলোচনা শোনা গিয়েছিল যে, রাশিয়ানরা এরূপ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু 'কাজ চালিয়ে যাচ্ছে' কথাটায়—গাণনিক কাজ করা হচ্ছে, না প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পন্ন রকেট-মোটরের প্রাথমিক পরীক্ষা করা হচ্ছে অথবা মডেল নিয়ে বায়ুসুড়ঙ্গের পরীক্ষা করা হচ্ছে—সে কথা পরিষ্কার করে বলা হয় নি। যাহোক, তারা যে এ বিষয়ে চিন্তা করছে—তাতে কোন

সন্দেহ ছিল না। কম পক্ষে অন্ততঃ বছর দশেক ধরে তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে আসছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে কোন্ এক সময়ে ভিয়েনার ডাঃ ইউজেন সেঙ্গার এই ধরণের বিমান তৈরীর পরিকল্পনা করেছিলেন। সর্ব প্রথম যাঁরা রকেট সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ডাঃ সেঙ্গার। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা কালেই রকেট-চালিত বিমান নির্মাণের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। কতকগুলি কারণে একটা বিষয় কার্যোপযোগী মনে হয়েছিল যে, এরূপ বিমানের পক্ষে খাড়াভাবে উপরে ওঠাই সুবিধাজনক। তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা অতি ঊর্ধ্বে উঠে যাবে এবং চলতি মুখেই শব্দগতির চেয়ে দ্রুততর গতি সম্পন্ন হয়ে উঠবে। 'হাইপারসনিক' কথাটা, প্রচলিত 'সুপারসনিক' কথার চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট অর্থব্যঞ্জক। 'সুপারসনিক' কথাটার সাধারণ ভাবে অর্থ হলো—শব্দের গতির চেয়ে দ্রুততর এবং 'হাইপারসনিক' বলতে বুঝায়—একটা সুনির্দিষ্ট গতিমাত্রা যা শব্দের গতির চেয়ে পাঁচ গুণ অথবা আরও বেশী দ্রুততর।

কিছুক্ষণ বাদে বিমানের আর ঊর্ধ্বগতি থাকবে না, বক্রপথে নীচে নেমে আসতে থাকবে। সর্বশেষে খুব ঢালু কোণে বাতাসের ঘন স্তরে প্রবেশ করে অনেক দূর ভেসে যাবে। ডাঃ সেঙ্গার ভাবতে লাগলেন এই সময়টায় বিমানটা যদি খুব দ্রুতগতিতে বাতাসের ঘন স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে, অথবা খুব ঢালু কোণ না করে, অনেকটা খাড়াভাবে আসে, তাহলে অবস্থা কি হবে? ডাঃ সেঙ্গার তাঁর সহকারী গণিতজ্ঞ ডাঃ আইরিন ব্রেটকে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে বলেন। তাঁরা উভয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুকুরের জলে একটা চ্যাপ্টা খোলামকুচি ছুঁড়ে

মারলে স্থির জলের উপর সেটা যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যায়—এ অবস্থায় বিমানটিও সেরূপ লাফিয়ে লাফিয়ে বাতাসের ঘন স্তর অতিক্রম করবে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনে হলো—তবে তো আর বেশী জ্বালানী খরচ না করে এর ফলেই বিমানের দৌড় পাল্লা অনেকখানি বেড়ে যাবে! তখনই তাঁরা সত্যিকার কাজে লেগে গেলেন। জ্বালানী সঞ্চয়ের জন্যে প্রথমে উপরে ওঠবার সময় বিমান তার নিজের শক্তি ব্যয় করবে না—রকেট-চালিত বিমান তাকে উচ্চগতি সম্পন্ন করে তুলবে। এর পর বিমানটি ভূমি থেকে ১৬০ মাইল উঁচুতে উঠবে। যাত্রারম্ভের স্থান থেকে অনুভূমিকভাবে পরিমাপ করলে শীর্ষস্থল পর্যন্ত তখন দূরত্ব হবে ১৫৫০ মাইল। ২৮০০ মাইল দূরত্বে বিমানখানি ২৫ মাইল নীচুতে নেমে আসবে এবং ঘনতর বায়ুস্তর লাফিয়ে পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় উচ্চতম শীর্ষস্থল হবে মাত্র ৭৮ মাইল ব্যাপী কিন্তু তখন দূরত্ব হবে ৩৫৭০ মাইল। এই দ্বিতীয় লম্ফনটি হবে যাত্রারম্ভের স্থান থেকে ৪৩৫০ মাইল দূরত্বে। এই লম্ফনগুলি ক্রমশঃ স্বল্প পরিসর এবং ছোট হতে থাকবে। এরূপ নয়টি লম্ফন হবে এবং নবমটির দূরত্ব হবে যাত্রারম্ভের স্থান থেকে ৯৮০০ মাইল।

এই সময়ের মধ্যে বিমানের গতি এতটা মন্থর হয়ে যাবে যে, সে আর লম্ফ প্রদান করবে না। ২৫ মাইল উচ্চতায় প্রায় ৪০০০ মাইল পর্যন্ত একটানা এগিয়ে যাবে। তারপরে আরম্ভ হবে 'গ্লাইডিং' অর্থাৎ হাওয়ায় ভেসে চলা; শেষ ৩০০ মাইল হাওয়ায় ভেসেই এগিয়ে যাবে। যাত্রারম্ভের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে পৃথিবীর চতুর্দিকের অর্ধেক পথ লাফিয়ে অতিক্রম করে বিমানটি ভূমিতে অবতরণ করবে।

সেঙ্গার ও ব্রেট কয়েক শত পৃষ্ঠায় টাইপ করে এর একটি পূর্ণাঙ্গ

মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং তার ৮০টি কপি জার্মানীর গণ্যমান্য লোকেদের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তখন যুদ্ধ শেষ হতে এক বছরেরও কিছু কম সময় বাকী ছিল, কাজেই এ বিষয়ে কেউ কিছু করেনি বা করতে পারেনি।

এর পরে কি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে এই ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী একজন সোভিয়েট কর্নেলের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। রাশিয়ানরা এই বিবরণীর একটি হস্তগত আটক করতে সক্ষম হয়। কোন এক ব্যক্তি রুশভাষায় অনুবাদ করে এর একটি সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত-সার ক্রমশঃ হাত বদল করে উচ্চতর পর্যায়ের ব্যক্তিদের হাতে পড়ে এবং সর্বশেষে ষ্ট্যালিনের ডেস্কে গিয়ে পৌছায়। সেটা পড়ে দেখবার পর ষ্ট্যালিন, তার সম্পূর্ণ বিবরণ অনুবাদ করবার আদেশ দেন। সম্পূর্ণ বিবরণ অনূদিত হবার পর দু-জন যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ, কর্নেল শেরোভ এবং কর্নেল টোকেয়েফকে পলিটবুরোর এক অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার আদেশ দেন। ভি-টু রকেট সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আলোচনা চলে; কিন্তু ম্যালেনকভ সেটাকে এই বলে বাতিল করে দেন যে—সেগুলির পাল্লা খুব বেশী নয়—আপনারা কি মনে করেন যে, আমরা পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি?

ষ্ট্যালিন তারপর কর্নেল টোকেয়েফকে ওই রিপোর্টের উপর রিপোর্ট দিতে আদেশ করেন। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে বক্তৃতা করেন। কিছুক্ষণ বিতর্কের পর সেঙ্গারকে খুঁজে বের করবার জন্যে তাঁর ছেলে ভ্যাসিলিকে আদেশ দেন এবং টোকেয়েফকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন। টোকেয়েফকে যেতে বলবার কারণ হয়তো এই যে, টোকেয়েফ জার্মান ভাষা বলতে পারেন। কিন্তু ডাঃ সেঙ্গার বা ডাঃ ব্রেট—দু-জনের কাউকে খুঁজে না পেয়ে তাঁরা শূন্য হাতে ফিরে

আসেন। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন! কারণ এই দু-জন বিজ্ঞানীই তখন ফরাসী গভর্ণমেণ্টের জন্যে কাজ করছিলেন এবং ঠিক সেই সময়েই তাঁরা আমাকে তাঁদের নতুন ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।

কিন্তু রাশিয়ানরা যখন ডাঃ সেঙ্গারকে গুম করবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তখনও তারা তাঁর তত্ত্বীয় কাজের কথা বিস্মৃত হননি। ১৯৫০ সালের মধ্যে রাশিয়া থেকে প্রথম প্রাপ্ত কাহিনীগুলির মধ্যে একটি খবরে প্রকাশ থাকে যে, যাত্রারম্ভের সময় প্লেনকে উপরে টেনে তুলতে সাহায্য করতে পারবে, এরূপ বড় বড় রকেট-মোটর নিয়ে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তী সময়ে কর্নেল টোকেয়েফ একটি মিশনে লণ্ডন যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং রাশিয়ায় আর ফিরে যাননি, কিন্তু তিনি 'ডেইলী এক্সপ্রেসে' তাঁর সংক্ষিপ্ত একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন।

ডাঃ আইরিন ব্রেট এখন মিসেস সেঙ্গার।

ডাঃ সেঙ্গার এখন পশ্চিম জার্মানীর রকেট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়—সেই বিখ্যাত রিপোর্ট এখন জার্মানী বা রাশিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু কয়েক ডলারের বিনিময়ে এই দেশে তার ইংরেজী অনুবাদ কিনতে পাওয়া যায়। রাশিয়ানরা এই ইঙ্গিত দিতে চান যে, তাঁরা ডাঃ সেঙ্গারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন। এ কথা সত্য কিনা তা কেউ জানে না; কিন্তু ঠিক এই সময়ে তাঁদের দাবী কেউ অবিশ্বাস করতেও সাহসী হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে ছোট্ট রকেট

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এক শ্রেণীর নতুন রকেটের নাম সব খবর ছাপিয়ে গিয়েছিল। এই নামগুলি হলো—নাইটডিকন (সংক্ষেপে বলা হয় ডি-এ-এন, যার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারিনি) নাইক-ক্যাজান, টেরাপিন এবং এইচ-টি-ভি (হাইপারসনিক টেষ্ট ভেহিকল-এর সংক্ষিপ্ত সার)। এদের প্রত্যেকেরই একটি সাধারণ বিশেষত্ব হলো এই যে, আকারে এগুলি খুবই ছোট—দৈর্ঘ্যে পনেরো ফুটের মধ্যে বা তারও কিছু কম এবং প্রস্থে দেড় ফুটেরও কম। এদের সবগুলিই চলে কঠিন জ্বালানীর সাহায্যে। এই জ্বালানীর ধুমবিহীন বারুদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা চলে এবং এদের সবগুলিই প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছে।

বছর দশেকেরও কম সময় পূর্বে এরূপ কোন যন্ত্র উৎক্ষেপণ বিশেষ একটা চিন্তার ব্যাপার ছিল। রকেট বলতে এক ছিল—প্রাক্তন জার্মান ভি-টু, উর্ধ্ব যাত্রার প্রাক্কালে যার ওজন দাঁড়াতো বারো টনেরও বেশী। আর ছিল নেভি ভাইকিং—সেগুলি ভি-টু-এর মতই লম্বা হতো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু হওয়ায় ওজনে মোটামুটি সাড়ে সাত টনের বেশী ভারী হতো না। উড্ডয়ন যাতে সুসম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার উদ্দেশ্যে ভাল্‌ভ, জ্বালানীর পাম্প

পরীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্যে ডজনখানেকেরও বেশী লোক রকেটের কাছে ভীড় জমাতো।

একথা সত্য যে, এই ভারী রকেটগুলি ট্রোপোস্ফিয়ারের (ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল) ভিতর দিয়ে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (পরবর্তী প্রায় ৩০ মাইল) পেরিয়ে আয়নোস্ফিয়ারে (ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের পরবর্তী অসম্ভব রকমের বিরল বায়ুস্তর) আধ টনেরও বেশী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি বয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এ রকমের একটা রকেটকে ভূমি থেকে নিরাপদে ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা একটা গুরুতর কাজ। আর বিজ্ঞানীরাও সব সময় রকেটে মাত্র আধ টন ওজনের যন্ত্রপাতি বহন করাতে চান না। অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় ২০ টনের মত ওজনের যন্ত্রপাতি উপরে পাঠাতে পারলেই তাঁরা খুশী হতেন।

যন্ত্রপাতির ছোট ছোট প্যাকেটগুলি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এরোবি রকেট তৈরী হয়েছিল। ভি-টু এবং ভাইকিং রকেটের মত এতেও তরল জ্বালানী ব্যবহার করা হতো, কিন্তু একটু পার্থক্য ছিল। ভি-টু ও ভাইকিং—উভয়েই ছিল 'এক-পর্য্যায়ী' রকেট; অর্থাৎ এরা নিজের শক্তিতেই ভূমি ছেড়ে উপরে উঠে যেতে পারতো। কিন্তু প্রথম উপরে ওঠবার সময় এরোবিকে অন্য শক্তির সাহায্য নিতে হতো। প্রথমে কঠিন জ্বালানীর 'বুষ্টার' অর্থাৎ সাহায্যকারী রকেট অগ্নিসংযোগ করা মাত্র এরোবিকে কয়েক হাজার ফুট উপরে তুলে দিয়ে সেকেণ্ডে প্রায় এক হাজার ফুট গতিবেগ দিয়ে দিত। তারপর এরোবির মোটর চলতে সুরু করতো এবং সঙ্গে সঙ্গে বুষ্টার রকেট এরোবি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে পড়ে যেতো। রকেটের গতিবেগ ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে সেকেণ্ডে প্রায় ৪১০০ ফুট দাঁড়াতো। এভাবে এরোবি প্রায় ৫৫ মাইল উপরে উঠতে পারতো। ভি-টু এবং প্রথম দিককার ভাইকিং রকেট যতটা উপরে উঠতো,

এরোবির এই উচ্চতা তার প্রায় অর্ধেকের মতো। কিন্তু পরবর্তী এরোবির রকেট, ভি-টু বা ভাইকিং-এর চেয়ে অনেক বেশী—অর্থাৎ প্রায় ১৯০ মাইল উর্ধ্বে আরোহণ করতে পেরেছে।

১৯৫৫ সালের মধ্যে রকেটের ক্ষেত্রে আরও অনেক বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। নতুন ধরণের রকেটগুলিকে প্রথমে উপরে তুলে দেবার জন্যে কঠিন জ্বালানী-চালিত বুষ্টার (সাহায্যকারী) রকেট ছিল; বিমান-বিধ্বংসী নাইক রকেটে বুষ্টার প্রায়ই ব্যবহৃত হতো। বুষ্টার-বাহিত রকেটগুলিও কিন্তু কঠিন জ্বালানীতেই চলতো। ডি-এ-এন গবেষণা-রকেটের বেলায় সেটা ছিল ডিকন শ্রেণীর।

ওয়ালপস্ দ্বীপ (ভার্জিনিয়ার উপকূল সন্নিকটস্থ) থেকে উর্ধ্বে উৎক্ষেপণের সময় সম্পূর্ণ রকেটটার ওজন ছিল ১৫৪০ পাউণ্ড মাত্র। যাতে নাইক বুষ্টার ও ডিকন রকেট উভয়েই আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়, সেই সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়েই রকেটটিকে ৭৫° ডিগ্রি কোণে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। অগ্নিসংযোগের সাড়ে তিন সেকেণ্ড পরেই নাইক বুষ্টার নিঃশেষিত হয়ে গেল; কিন্তু রকেটটি তখন সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৪৯০০ ফুট উপরে উঠে গেছে। বুষ্টারটা তখন নীচে পড়ে গেল এবং ডিকন রকেটটা প্রায় ১৪ সেকেণ্ড পর্যন্ত উর্ধ্বে আরোহণ করে প্রায় ৪০,০০০ ফুট উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছলো। গতি বিলম্বিত হবার কারণ এই যে, ৫০০০ ফুট উচ্চতায়, বাতাসের প্রতিবন্ধকতা ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ু-প্রতি বন্ধকতার প্রায় সমান। বুষ্টারটি বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ডিকনে অগ্নিসংযোগ ঘটতো, তাহলে বাতাসের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতেই তার বেশীর ভাগ শক্তি ব্যয়িত হয়ে যেত।

বিলম্বিত হওয়ার দরুণই ৪৭,০৬০ ফুট উচ্চতায় সে সর্বোচ্চ গতি লাভ করেছিল সেকেণ্ডে ৫১৫০ ফুট। তারপর সেটা ৩৫৬,০০০ ফুট

অর্থাৎ ৬৭·৪ মাইল উচ্চতা পর্য্যন্ত কেবল তার ভরবেগের দ্বারাই চালিত হয়েছিল। এটা যদি খাড়াভাবে উৎক্ষিপ্ত হতো, তাহলে ১০ পাউণ্ড ওজেনের যন্ত্রাদি নিয়ে ৪·৮৭,০০০ ফুট, অর্থাৎ ৯২·২ মাইল উর্দ্ধে উঠে যেতে পারতো।

ডি-এ-এন রকেটের পরে এলো টেরাপিন—অধিকতর কার্য-দক্ষতার পরিচয় দিল। ওয়ালপস্ দ্বীপ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এই রকেট ৮০ মাইল উপরে উঠে যায়। ভূমি ছেড়ে উপরে ওঠবার সময় এর ওজন দাঁড়ায় মাত্র ২২৪ পাউণ্ড এবং সবচেয়ে বড় ব্যাসের পরিমাপ হচ্ছে সাড়ে ছয় ইঞ্চি। টেরাপিন হলো দু-পর্যায়ী' রকেট। যদি তৃতীয় পর্যায়ে আর একটি বুষ্টার, অর্থাৎ সাহায্যকারী রকেট দিয়ে একে উপরে তুলে দেওয়া যেতো তবে ২০০ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠতে পারতো। ডি-এ-এন এবং টেরাপিনের মত সাধারণ আর একপ্রকার রকেট হলো—নাইক ক্যাজান। নাইক ক্যাজান ১০০ মাইল উপরে উঠতে পারবে বলে আশা করা যায়, এবং আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে ১০০-টিরও বেশী এই রকেট উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হবে।

এই ছোট রকেটগুলি যে তরল জ্বালানী-চালিত বড় রকেটের সঙ্গে যতদূর সম্ভব উর্ধ্বে উঠবার প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারে, এতে একথা বুঝায় না যে, বড় রকেটগুলি এখন অপ্রচলিত বা অব্যবহার্য হ'য়ে গেছে। কিন্তু যে সব যন্ত্রপাতি উর্ধ্বাকাশে পাঠানো হবে, সেগুলি ওজনে যদি বেশী ভারী না হয় তবে বড় রকেটের আর বেশী প্রয়োজন থাকবে না।

আন্তর্জাতিক ভু-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষে 'রকেয়ার'

আপনি যখন এসব পড়ছেন, ঠিক সে সময়েই হলোম্যান বিমান উন্নয়ন কেন্দ্রের উপরে বিমান বাহিনীর জঙ্গী-বিমানগুলি অদ্ভুত ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শন করতে থাকবে। এই বিমানগুলি হলো এফ-৮৬-ডি জেট ফাইটার শ্রেণীর এবং তাদের ডানার নীচে বোমার মত অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলি জিনিষ বয়ে নিয়ে যাবে। সাধারণ বিমানের মতই তারা ভূমি ছেড়ে উপরে উঠে যাবার পর ঊর্ধ্বস্তরে আরোহণ করবে। ভূমিতে যেখানে যন্ত্রাদি স্থাপন করা হয়েছে, সেখান থেকে বেশী দূরে না উঠে যায়, সেজন্যে সম্ভবতঃ বক্রাকার পথে ঘুরে ঘুরে উঠবে।

৩০,০০০ ফুট উপরে ওঠবার পর হঠাৎ বিমানগুলি তাদের ডগার দিকটা উপরের দিকে টেনে তুলতে থাকবে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিমানগুলি খাড়া না হয়ে উঠে। খাড়া হয়ে ওঠবার পর যথাযথ মুহূর্তে অগ্নি সংযোগের জন্যে পাইলট একটি বোতাম টিপে দেওয়া মাত্র ডানার নীচে রক্ষিত যন্ত্রটা সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং রকেটের মত ভীষণ গর্জন করে বিমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা উপরে উঠে যাবে। তখনও কিন্তু বিমানের ডগাটাকে উপর দিকে টেনেই রাখা হচ্ছে এবং এর ফলে বিমানটা ক্রমশঃ পিঠের দিকে ঘুরে যাবে। এই বৃত্তাকার পথটা সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানের ডগাটা নীচের দিকে এসে যাবে এবং পাইলটও তখন প্রায়-সোজাসুজি নীচে নেমে আসবে।

ইতিমধ্যে নীচে অবস্থিত রাডার এবং পথরেখা অনুসরণকারী অন্যান্য যন্ত্রপাতি রকেটটির গতিবিধি-অনুসরণ করে দেখবে, কিভাবে সেটা কাজ করছে এবং ৪০ পাউণ্ড ওজনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

নিয়ে ৪০ মাইলেরও বেশী উচ্চতায় ঠিক মত উঠে যেতে পেরেছে কি না।

এই পদ্ধতিকে বলা হয় রকেয়ার—'air-launched rocket' কথাগুলিকে এদিকে-ওদিক ঘুরিয়ে শব্দটা তৈরী হয়েছে। ১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষে ঊর্ধ্ব বায়ু-মণ্ডলের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্যে এই রকেয়ার পদ্ধতি সহায়ক হবে। যে সব রকেট এই কাজের জন্যে ব্যবহৃত হবে সেগুলি হলো বিশেষ ফ্রেমের মধ্যে আঁটা নির্দিষ্ট মানের ঊর্ধ্বগামী রকেট। যেহেতু এগুলি নির্দিষ্ট মানের জিনিষ, যা সর্বদাই তৈরী হচ্ছে, সেহেতু এগুলি ব্যয়বহুল নয়। আর ফাঁসের মত বৃত্ত রচনা করে উপরে ওড়া জেট-জঙ্গী বিমানের একজন পাইলটের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

জেট ফাইটারের ডানার নীচে রকেট বহন করে নিয়ে যাওয়ার কারণ হলো এই যে, এতে রকেটকে নীচের ঘন বাতাসের প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না। সমুদ্র-পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রায় ৩০ ইঞ্চি; কিন্তু ৩০,০০০ ফুট উচ্চতায় এই চাপ প্রায় ৮ ইঞ্চিতে নেমে যায়। কাজেই একথা সহজেই বোঝা যায়, অত উঁচুতে রকেট কেন খুব ভালভাবে যাত্রা সুরু করতে পারে।

স্বভাবতঃই ফাইটার প্লেন তার রকেটকে যতদূর সম্ভব উঁচু থেকে যাত্রা সুরু করাবার চেষ্টা করে। হিসেব করে দেখা গেছে প্রত্যেক হাজার ফুট অতিরিক্ত উচ্চতা থেকে যাত্রা সুরু করলে রকেট ৭০০০ ফুট করে বেশী ঊর্ধ্বে আরোহণ করবে। কাজেই যদি কোন ফাইটার প্লেন ৩০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে রকেটে অগ্নিসংযোগ করে এবং অপর একটি প্লেন ৩৬,০০০ ফুট উপরে উঠে রকেটকে ঊর্ধ্বে প্রেরণ করে, তবে দ্বিতীয় প্লেনের রকেটটি প্রথম প্লেনের রকেটের চেয়ে ৪২,০০০ ফুট বেশী উপরে উঠবে। রকেটকে বেশী

উপরে তোলবার অন্য উপায় হলো—যে জিনিষ বয়ে নিয়ে যাবে তার ওজন কমিয়ে দেওয়া। প্রতি পাউণ্ড ওজন হ্রাসের জন্যে রকেট ২,০০০ ফুট বেশী উর্ধ্বে আরোহণ করবে। একটি রকেট ৩০ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি নিয়ে ৪০ পাউণ্ড ওজন বহনকারী রকেটের চেয়ে ২০,০০০ ফুট বেশী উপরে উঠবে, যদিও উভয়ে একই উচ্চতা থেকে যাত্রা সুরু করে।

ঠিক ঐ সময়ে লিখনক্ষম যন্ত্র—যেগুলি রকেট কর্তৃক পরিবাহিত যন্ত্রের সংগৃহীত সংবাদ লিপিবদ্ধ করে—ভূমির উপরেই স্থাপিত থাকে। কিন্তু বিমানবাহিনী সেগুলিকে সি-১৩১-বি কনভেয়ারে স্থাপন করে চলমান করবার জন্যে এরূপ পরিকল্পনা করেছেন যে, সে কনভেয়ারটিও ফাইটার প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে রকেট উৎক্ষেপণ স্থলের উচ্চতায় উঠে যাবে। যা করতে হবে, সেটা হলো এই যে, প্রথমে সি-১৩১ নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে গিয়ে চক্রাকারে উড়তে থাকবে। তারপর এফ-৮৬ ফাইটার প্লেনগুলি একের পর এক করে সেই উচ্চতায় উঠে গিয়ে মূল প্লেনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকেই তাদের রকেটে অগ্নি-সংযোগ করতে থাকবে।

অতি উন্নত ধরণের চলন-পদ্ধতির জন্যই স্বভাবতঃ এসব ব্যবস্থা করা হয়, যাতে পৃথিবীর যেখানে জেট ইঞ্জিনের জ্বালানী অথবা বিমানের জন্যে গ্যাসোলিন পাওয়া যায়—এরূপ যে কোন স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে। নৌ-বাহিনীরও ঠিক একই রকমের পরিকল্পনা আছে, যা আরও বেশী সচল। যেহেতু মূল বিমান এবং ফাইটার প্লেন—উভয়কেই বিমানবাহী জাহাজে পরিবহন করা যাবে।

উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের গবেষণার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রকেটগুলি আন্ত-র্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে স্বভাবতঃই রকেট উৎক্ষেপণের উপযোগী মাত্র কয়েকটি জায়গা থেকেই উৎক্ষিপ্ত হবে। এই উৎক্ষেপণ

স্থলগুলি ক্যানাডা থেকে গুয়াম পর্যন্ত বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে থাকলেও সুনির্দিষ্ট স্থলে অবস্থিত। কিন্তু চলমান ইউনিটগুলি যে কোন জায়গা থেকে রকেট উৎক্ষেপণে সক্ষম।

সৌর রহস্য অনুসন্ধানে 'রকুন'

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে যেসব পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো—প্রায় চল্লিশটি 'রকুন' উৎক্ষেপণ। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছর ১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে আরম্ভ হয়ে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ঠিক দেড় বছর ধরে চলেছে। এটা হলো একটা সুচিন্তিত পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা, যাতে পৃথিবী গ্রহের যাবতীয় বিসয় সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে ৫০-টিরও বেশী রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছে।

'রকুন' জিনিষটা কি, তার একটু সামান্য বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। রকেট এবং বেলুন—এই দুটি শব্দ একত্রে জুড়ে 'রকুন' কথাটা তৈরী হয়েছে। এবং এই যান্ত্রিক কৌশলটাও অনেকটা অসম এই দুটি বস্তুর সমন্বয় মাত্র। বিশেষ একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তিন-চার বছর পূর্বে ডাঃ জেম্স্ এ. ভ্যান. অ্যালেন রকুনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর সমস্যাটা ছিল—কেমন করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিপূর্ণ ছোট্ট একটি প্যাকেট প্রায় ৪০ মাইল উর্ধে তোলা যেতে পারে।

এখানে আমার নিজের কথাই সংশোধন করা দরকার। যন্ত্রের ছোট্ট একটা প্যাকেট প্রায় ৪০ মাইল উর্ধে তোলবার সমস্যা ঠিক নয়; কারণ সেটা পূর্বেই সমাধান করা হয়েছে। আসল সমস্যা হলো—

কেমন করে কাজটা সুলভে করা যায়। এবং সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু ডাঃ ভ্যান অ্যালেন একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। ডেকন নামে কঠিন জ্বালানী-চালিত রকেট অনায়াসেই যন্ত্রাদি বয়ে নিয়ে যেতে পারে! কিন্তু ডেকন শক্তিশালী রকেট হলেও ৪০ মাইল উচ্চতায় কখনও উঠতে পারে নি। এর জ্বালানী খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়, কাজেই তার গতি হয় অতি দ্রুত। দ্রুততার অতি বৃদ্ধির জন্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের সমতল থেকে উৎক্ষিপ্ত হবার সময় বায়ুর বাধা অতিক্রম করতেই তার অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়।

অগ্নিসংযোগের পূর্বে কোন রকমে ডেকন রকেটকে যদি দশ বারো মাইল উপরে তুলে নেবার উপায় থাকত তবে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হতো। দশ মাইল উপরে বাতাস অনেক হাল্কা—সমুদ্র-পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ হচ্ছে ৭৬০ মিলিমিটার; তার তুলনায় ১০ মাইল উচ্চতায় বায়ুর চাপ ৯০ মিলিমিটারেরও কম। কাজেই সেখানে বাতাসের বাধাও কম। তথাকথিত 'স্কাইহুক্স' পদ্ধতিতে রকেটকে ১০ মাইল উপরে তোলবার ব্যবস্থায় অনেকখানি উন্নতি সাধিত হয়েছে। 'স্কাইহুক্স' হচ্ছে আসলে পাতলা স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের তৈরী বিশাল আকৃতির বেলুন। এই বেলুনগুলির নিজস্ব ওজন কম বলে খুব উঁচুতে উঠতে পারে এবং প্রায় ১০০ পাউণ্ডের মত ভারী জিনিষ সঙ্গে বহন করতে পারে। কাজেই ডাঃ ভ্যান অ্যালেন স্কাইহুকের সঙ্গে তার রকেট হেলানোভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে (হেলানো-ভাবে ঝুলিয়ে দেবার কারণ হলো—উৎক্ষিপ্ত হবার সময় রকেট যেন বেলুনটাকে এড়িয়ে যেতে পারে) তাতে একটা স্বয়ংক্রিয় চাপ-নিয়ন্ত্রিত সুইচ (চাবি) বসিয়ে দিলেন। এই স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থার কাজ হলো এই যে, বেলুনটা উপরে উঠে গেলে বায়ুর

চাপ যখন খুব কমে যাবে তখন চাপ হ্রাসের দরুণ সুইচটা সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রকেটে অগ্নিসংযোগ করবে।

রকুন যখন প্রথম ব্যবহার করা হয়, তখন যে সব যন্ত্রাদি বয়ে নিয়ে যেত তাদের কাজ ছিল মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে তাদের কাজ হবে—সূর্যের পৃষ্ঠে কি ঘটছে, সে বিষয় অনুসন্ধান করা। সেই ঘটনাটার নাম হচ্ছে সৌর-দীপ্তি বা সোলার ফ্লেয়ার। সৌর-দীপ্তি হলো সৌরদেহের কোন ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে নির্গত আলোর বিচ্ছুরণ (এটা যে এক্স-রে'রও বিচ্ছুরণ, সেটা ঠিকই সন্দেহ করা হয়েছিল)। এই দীপ্তি সাধারণতঃ অল্প কয়েক মিনিট মাত্র স্থায়ী হয়। কিন্তু দীপ্তির শেষে প্রায়ই মাঝারি দৈর্ঘ্যের একটা স্তিমিত আলো অথবা হ্রস্ব রেডিও তরঙ্গ পাওয়া যায় এবং তা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরের পরিকল্পনা হলো—রকুনগুলি ৮০,০০০ ফুট উচ্চতায় উঠে ডেকন রকেটগুলিকে নিয়ে এমনভাবে প্রস্তুত থাকবে যেন অগ্নিসংযোগ করা মাত্রই সেগুলি বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত এক্স-রে'র অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে পারে। সৌর-দীপ্তি দেখামাত্র ভূমি থেকেই হোক, জাহাজের উপর থেকেই হোক রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে বেলুনে অবস্থিত রকেটগুলিতে অগ্নিসংযোগ ঘটবে।

এতেই কি আশানুরূপ কাজ হবে।

কাজ অবশ্য এতেই হবে, তবে উত্তরটা ঠিক আশাপ্রদ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা জানি—এটা হবে; কারণ ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের শেষার্ধে ইউ. এস. এস. কলোনিয়েল জাহাজ যখন স্যানডিয়েগোর ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরে

টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন তার উপর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে এরূপ ১০টা রকুন ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন এমন একটা অবস্থা ঘটেছিল যে, আকাশ প্রায় সারাক্ষণই মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ইউ. এস. এস. কলোনিয়েল জাহাজ থেকে (এবং ডেষ্ট্রয়ার ইউ. এস. এস. পার্কিন, যেটি রাডার যন্ত্রাদি দ্বারা সহায়তা করছিল) বিজ্ঞানীরা সূর্যের মুখই দেখতে পান নি। রেডিও-তরঙ্গের স্তিমিত অবস্থা দেখেই তাঁরা সৌর-দীপ্তি নির্ধারণ করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেতার-কৌশলে রকুনে স্থাপিত রকেটে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিসংযোগের পর দেড় মিনিট বা দু-মিনিটের মধ্যেই রকেট ষাট থেকে সত্তর মাইল উপরে উঠে যায়।

এই অবস্থায় রকেট—অর্থাৎ রকেট-বাহিত যন্ত্রাদি, সৌর-দীপ্তি মিলিয়ে যাবার পূর্বে সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে পারে নি। তবুও অস্বাভাবিক পরিমাণ এক্স-রে'র সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, এই পরীক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী হবে।

নৌ-বাহিনীর নতুন রকেট

মার্কিন নৌ-বাহিনী দুটি নতুন রকেট তৈরী করেছে, কিন্তু সেগুলি তাদের অস্ত্রাগারের জন্যে নয়। দুটিই শান্তিপূর্ণ কার্যোপযোগী রকেট। ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এগুলি তৈরী হয়েছে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই শান্তি-পূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে এদের সঙ্গে তৃতীয় আর একটি রকেট যোগ করা হবে। (নক্ষত্রপুঞ্জের) তিনটি ভল্লুকের মত নৌ-বাহিনীর এই রকেট তিনটি মধ্যমাকৃতির; কিন্তু সবচেয়ে বড়টি লম্বায় পুরো বিশ

ফুটও হবে না। ছোট থেকে ক্রমশঃ বড়র দিকে এদের নাম হলো—এইচ-এ-এস-পি, আর্কন এবং আইরিশ।

এইচ-এ-এস-পি—(হাই অলটিচ্যুড সাউণ্ডিং প্রোজেকটাইল শব্দগুলির প্রত্যেকটির আন্ত অক্ষর নিয়ে শব্দটি গঠিত) রকেটের বেশ একটু লম্বা ইতিহাস আছে। প্রায় বছর বারো আগে একটি অভিপ্রেত অস্ত্র হিসেবে জার্মানীতে এর কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছিল। পিনেমুণ্ডীর জার্মান রকেট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সাফল্যের সঙ্গে ৪৬ ফুট লম্বা প্রকাণ্ড একটি ভি—২ রকেট তৈরী করেছিল। কিছু কাল পরে এই ইনষ্টিটিউট একই সময়ে বিভিন্ন রকমের তিনটি রকেট তৈরীর কাজে ব্যাপৃত হয়। এদের মধ্যে একটির মাত্র সাংকেতিক সংখ্যা ছিল—এ-নাইন। এটা হওয়ার কথা ছিল—ডানাওয়ালা এক রকম ভি-২ রকেট। এর পাল্লা হওয়ার কথা ছিল ৩০০ মাইল—ভি-২-এর পাল্লার চেয়ে ১০০ মাইল বেশী।

জার্মানরা এ-নাইনের নির্মাণকার্য শেষ করে উঠতে পারে নি, যদিও বলা হয় যে, রাশিয়ানরা এর নির্মাণকার্য শেষ করেছিল। দ্বিতীয়টি ছিল ২৪ ফুট লম্বা ভাসারফল (ওয়াটারফল) নামক (রেডিও) নিয়ন্ত্রিত বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। এটাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু (কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্যে) উৎপাদন করা হয় নি। পরবর্তী কালে 'হারমিস' নামে ভাসারফলের একটি আমেরিকান সংস্করণ অল্প সময়ের জন্যে সংগোপনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। জার্মানরা যে তৃতীয় রকেটটি নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত হয়েছিল, সেটি সবচেয়ে সরল হবার কথা ছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছিল—Taifun (উচ্চারণ Typhoon—উভয়ের অর্থও এক)। এটা হতো বেশ ছোট ও সুলভ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাবিহীন। মিত্রশক্তির বোমারু বিমানগুলির বিরুদ্ধে লক্ষ

লক্ষ টাইফুন ছুঁড়ে বিশাল একটা শটগানের মত অবস্থা সৃষ্টি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। টাইফুনের নির্মানকার্যও শেষ হতে পারে নি; কিন্তু মার্কিন সৈন্য বাহিনী এ সম্বন্ধে যা কিছু জানবার জেনে নিয়ে এটাকে সম্পূর্ণরূপে তৈরী করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তরল দাহ্য পদার্থের সাহায্যে পরিচালিত হবে—এই ছিল প্রথম টাইফুন সম্বন্ধে পরিকল্পনা; কিন্তু সেনাবাহিনী সেটাকে কঠিন জ্বালানীর রকেটরূপে তৈরী করে' টাইফুনের পরিবর্তে 'লকি' নামে অভিহিত করে।

কয়েক বছর পরে সেনা-বাহিনী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আধুনিক বিমানের বিরুদ্ধে লকি কার্যকরী হবে না, কারণ সেটা ছিল খুবই ছোট; মাত্র কয়েক পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রাদি নিয়ে ২০ মাইল উপরে উঠতে পারতো। আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্যে মাত্র কয়েক পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রাদি নিয়ে প্রায় ২০ মাইল উপরে উঠতে পারে—নৌবাহিনীর ঠিক এরূপ রকেটেরই প্রয়োজন ছিল। কাজেই নৌ-বাহিনী লকিকে গ্রহণ করে এবং এইচ-এ-এস-পি—এই নতুন নাম রাখে। কোন রকম অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে নৌবাহিনী এইচ-এ-এস-পি রকেট ব্যবহারে সক্ষম হলো এই কারণে যে, এই রকেট উৎক্ষেপণের জন্যে বিশেষ রকমের কোন উৎক্ষেপণ মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। নৌ-বাহিনীর ৫ ইঞ্চি কামানের নলের মধ্যে একে অনায়াসে বসানো যায়। কাজেই কামানই এ-ক্ষেত্রে উৎক্ষেপণ-মঞ্চের কাজ করে।

আর্কন বা আইরিশ—কোনটারই এ রকমের কোন ইতিহাস নেই। সমুদ্রের উপর বায়ুমণ্ডলের আবহ-তথ্য সংগ্রহের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই রকেট দুটি তৈরী হয়েছিল। আর্কন নামটি রাখা হয়েছিল এর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান—দি আটলান্টিক রিসার্চ

করপোরেশনের সংক্ষিপ্ত নামানুসারে। দৈর্ঘ্যে এটা ১১ ফুট ২ ইঞ্চি এবং প্রস্থে মাত্র ৬ ইঞ্চি। ৪০ পাউণ্ড যন্ত্রপাতি নিয়ে আর্কন প্রায় ৭০ মাইল উপরে উঠে যেতে পারে। উৎক্ষেপণকালে আর্কনের ওজন হয় মাত্র ২৫০ পাউণ্ড।

অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আইরিশ রকেট সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আর্কন তার স্থান অধিকার করেছিল। নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হলে আইরিশের দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে ষোল ফুট-এর ডগার দিকের ৫ ফুট লম্বা কোণাকৃতি অংশটার মধ্যে থাকবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। আইরিশের ব্যাস হবে ঠিক এক ফুটের মত। প্রায় ১০০ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি নিয়ে ২০০ মাইল উপরে উঠে যেতে পারবে। প্রস্তুত হবার পর জাহাজ থেকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আইরিশ নৌ-বাহিনীর এরোবি-এইচ-আই নামক আর একটি রকেটের স্থান গ্রহণ করবে। এর কারণ হলো—এরোবি-এইচ-আই তরল জ্বালানীর সাহায্যে চালিত হয়, আর আইরিশ চলে কঠিন জ্বালানীর সাহায্যে। সমুদ্র অর্থাৎ জাহাজের উপর একে সহজে নাড়াচাড়া করা যাবে বলে আশা করা যায়।

গ্রহের সর্বত্র রকেট

বছর পাঁচেক পূর্বে শিকাগো থেকে টরন্টো পর্যন্ত এক বিমান-যাত্রার সময় আমার পার্শ্ববর্তী আসনে ছিলেন একজন ক্যানাডিয়ান আবহ-বৈজ্ঞানিক। তথ্যটা জানা গেল, দূরবর্তী একটা অস্বাভাবিক রকমের মেঘের জমায়েত সম্পর্কে হঠাৎ একটা মন্তব্য প্রসঙ্গে তারপর আমরা বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। হোয়াইট স্যাণ্ডস্ প্রুভিং গ্রাউণ্ড থেকে রকেট ছেড়ে উচ্চ

বায়ুমণ্ডলের তথ্যাদি সংগ্রহের সুদীর্ঘ বিবরণ ক্যানেডিয়ান ভদ্রলোকটি সবে মাত্র পাঠ করেছিলেন। 'খুব আশ্চর্য, খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার বটে'—বললেন ভদ্রলোকটি। নিউ মেক্সিকোর উর্ধ্বতন বায়ুমণ্ডলের বিষয় এখন আমি বুঝতে পারি বটে, কিন্তু নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উর্ধ্বাকাশ সম্বন্ধে এথেকে কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

এই বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীই বলেছেন। সেই সময়কার বৃহদাকৃতির রকেটগুলি—যাদের অধিকাংশই ছিল তখনও পর্যন্ত প্রাক্তন জার্মাণ ভি-টু—উর্ধ্বে প্রেরণের জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরী উৎক্ষেপণ ভূমির প্রয়োজন হতো। এ জন্যেই অধিকাংশ রকেট একটি নির্দিষ্ট জায়গা, অর্থাৎ হোয়াইট স্যাণ্ডস্ প্রুভিং গ্রাউণ্ড থেকে উৎক্ষিপ্ত হতো এবং সেই সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির উপর পরীক্ষালব্ধ ফল কেমন করে আরও দূরতর উত্তরাঞ্চল অথবা সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হতে পারে—সে সম্বন্ধে কেউ সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারতো না। বিষয়টা বুঝতে হলে হোয়াইট স্যাণ্ডস্ ছাড়াও তুলনামূলকভাবে অন্ততঃ আরও কয়েকটি জায়গা থেকে রকেট উৎক্ষেপণের প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল পোষিত এই আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশেই পূর্ণ হবে। পূর্ব প্রচারিত কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন জায়গা থেকে উর্ধ্বাকাশে রকেট উৎক্ষেপণেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। ইউ. এস. নৌ এবং বিমানবাহিনী—উভয়েই তাদের রকেয়ার নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। রকেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যুদ্ধ-বিমান থেকে শক্তিশালী রকেট উর্ধ্বাকাশে—৪০,০০০ ফুট বা তার কাছাকাছি উচ্চতায় প্রেরিত হবে। তাছাড়া রকুনের পরিকল্পনাও রয়েছে, যাতে বিশাল আকৃতির 'স্কাইহুক' প্লাষ্টিক বেলুন ঐ রকম

শক্তিশালী রকেটগুলিকে উৎক্ষেপণের পূর্বে ৭০,০০০ থেকে ৮০,০০০ ফুট উপরে বয়ে নিয়ে যাবে। এসব রকেটে অগ্নিসংযোগ করবার উদ্দেশ্যে নৌ এবং বিমান-বাহিনী—উভয়েই তাদের সঙ্গে প্রায় যে কোন জায়গায়ই যেতে পারবে।

কিন্তু সে জন্যে ভূমি থেকে রকেট উৎক্ষেপণের ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করা হয়নি। এখন থেকেই দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার উমেরার নিকটবর্তী রকেট-উৎক্ষেপণ রেঞ্জে কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরের জন্যে বিশেষভাবে তৈরী স্কাইলার্ক নামক রকেট পরীক্ষার জন্যে বৃটিশেরাও সেখানে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করছে। স্কাইলার্ক হলো ২৫ ফুট লম্বা এবং সাড়ে সতেরো ইঞ্চি ব্যাসের কঠিন জ্বালানী চালিত রকেট। এতে বৃষ্টল এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ কর্তৃক উদ্ভাবিত 'র‍্যাভেন' নামে এক প্রকার জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। প্রায় আধ মিনিট সময়ের জন্যে এই জ্বালানী ১১,৫০০ পাউণ্ড চাপ উৎপন্ন করতে পারে। আশা করা যায়, স্কাইলার্ক প্রথমে ৭০ মাইল উপরে উঠতে পারবে এবং এর যে উন্নত সংস্করণটি তৈরী হচ্ছে, সেটি হয়তো ১২০ মাইল অবধি যেতে পারবে। স্কাইলার্ক একমাত্র দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া থেকেই নিক্ষিপ্ত হবে না। অষ্ট্রেলিয়া থেকে যে রকেট পরীক্ষা হবে, এখন তার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো—আগে থেকেই যাতে সুনির্দিষ্টরূপে জানা থাকতে পারে—এরূপভাবে রকেটের গতিপথ নির্ধারণ করা। স্কাইলার্ক কিভাবে উড়বে—সে সম্বন্ধে একবার যদি প্রত্যেকেই নিশ্চিত হতে পারেন তাহলে এই রকেটটি ওয়েল্‌স্‌-এর অ্যাবারপোর্থ থেকেও ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হবে।

ইতিমধ্যে উত্তর আমেরিকার সর্বাধিক উত্তরাঞ্চলে ক্যানাডার ফোর্ট্‌ চার্চিলে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরের জন্যে আর একটি ঊর্ধ্বাকাশযাত্রী রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে

আমেরিকান ও ক্যানাডিয়ানরা প্রাণপণে কাজ করে যাচ্ছেন। রেলের সাহায্যে অনায়াসে ওখানে ভারী ভারী মালমসলা পাঠানো চলবে। ফোর্ট চার্চিল থেকে যে সব রকেট উৎক্ষিপ্ত হবে, সেগুলি হলো এরোবি-এইচ-আই এবং নাইক-ক্যাজান রকেট। এরোবি-এইচ-আই রকেটগুলি তরল জ্বালানীর দ্বারা চালিত হয় বটে, কিন্তু প্রথমে মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে তাকে সাহায্য করে কঠিন জ্বালানী-চালিত উৎক্ষেপক—যাকে বলা হয় বুষ্টার। আর নাইক ক্যাজান হলো কঠিন জ্বালানী-চালিত রকেট। এগুলি প্রথমে ঊর্ধ্বযাত্রা সুরু করে বিমান-বিধ্বংসী নাইক রকেটের বুষ্টার অর্থাৎ উৎক্ষেপকের সাহায্যে।

ইতিপূর্বেই—১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ফোর্ট চার্চিল থেকে কতকগুলি রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। সোজাসুজি গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ে যতটা না হোক, ক্যানাডার শীতের সময় রকেটগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়—প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্য নিয়েই রকেটগুলিকে ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা হয়। এই পরীক্ষার ব্যাপারে যে ৭টি রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়, তার মধ্যে একটি ছিল নাইক-ক্যাজান এবং সেটি বেশ ভালই কাজ করে। আর একটি ছিল পুরণো মডেলের এরোবি—সেটিও ভাল ভাবেই কাজ করেছিল বটে; কিন্তু পিছনের ঝাপ্টার ফলে উৎক্ষেপণ মঞ্চের নীচে অবস্থিত আশ্রয় স্থলটির পার্শ্বদেশ উড়ে যায়। অপর পাঁচটি ছিল এরোবি-এইচ-আই রকেট—তাদের চারটি ভালই কাজ করেছিল; কিন্তু মঞ্চের উপরেই একটির বিস্ফোরণ ঘটে। এরূপ ব্যাপার সত্যই আশা করা যায় না; কিন্তু রকেটি নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের এরূপ এক-আধটা বিস্ফোরণের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়। তাঁরা যেটা আশা করেননি বা যে বিষয়ে কোন অভিযোগও করেননি, সেটা হলো—

বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—নর্থ ক্যারোলাইনার শারলোটের ট্যাক্সি গাড়ীর রেডিও থেকে তাঁদের রেডিও সিগ্ন্যালের প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন।

উধ্বর্াকাশ সম্পর্কে রাশিয়ার গবেষণা

রাশিয়ার রকেট গবেষণার তত্ত্বগত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনশ্রুতির বিষয় সুলভেই ক্রয় করা যায় বটে। তবে সেগুলি এবং রাশিয়ার পেশাদার সাময়িক পত্রাদি পাঠে এ-সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। কিন্তু কদাচিৎ কোন দীর্ঘ ব্যবধানের অনুষ্ঠানে রাশিয়ার রকেটের কাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকৃত খবর রাশিয়ানদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়ে থাকে। ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে রকেট ও মহাশূন্য পরিভ্রমণ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে প্যারিসে এ রকমের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে এ সম্বন্ধে রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের তথ্যবহুল দুটি নিবন্ধ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উধ্বর্ বায়ুমণ্ডলের অবস্থা সম্পর্কে রাশিয়ানরা কেমন করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে—এর একটি নিবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা ছিল এবং অপর নিবন্ধটিতে প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষার বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। উধ্বর্ বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে তথ্যাদি জানবার জন্যে আমাদের (আমেরিকানদের) প্রধানতঃ টেলিমিটারিং-এর উপরেই নির্ভর করতে হয়, যার অর্থ হলো—(উধ্বের্ প্রেরিত যন্ত্রের সাহায্যে) যে সব তথ্যাদি সংগৃহীত হয়, সেগুলি রেডিও-পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠে প্রেরিত হয়ে থাকে। রাশিয়ানরা তাদের নিজস্ব কতকগুলি কারণে স্থির করে যে, এই পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নয় এবং তারা অপর একটি উপায় উদ্ভাবন করে যাকে 'ড্রপ ক্যাপ্সুল্স্' পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

এরূপ এক একটি ক্যাপ্‌সুলের দৈর্ঘ্য সাড়ে ছয় ফুট এবং ব্যাস ১৫ ইঞ্চি। ক্যাপ্‌সুলের তলার দিকে ধাতুনির্মিত নিরেট একটা সরুমুখ গোঁজ থাকে। ক্যাপসুলটা নীচে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গোঁজটা মাটিতে গেঁথে যায়। রকেটের সাহায্যে ক্যাপ্‌সুলটা যখন উপরে উঠে যায় তখন তার মাথার দিকে একটা আধারের মধ্যে বিশেষ কৌশলে একটা প্যারাস্যুট আবদ্ধ থাকে। উপরের অবস্থা লিপিবদ্ধ করবার যন্ত্রপাতি এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থাপিত ডায়েলের ফটো নেবার জন্যে বর্মাবৃত ক্যামেরা প্রভৃতি থাকে ক্যাপ্‌সুলের বাকী অংশে। উপর থেকে পড়বার সময় কোন কারণে প্যারাস্যুট না খুললে, অথবা প্যারাস্যুট ছাড়া ক্যামেরা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেলেও ছবিগুলি অক্ষতভাবেই পাওয়া যেতে পারে।

আমেরিকান গবেষণাকারীরা এরূপ পদ্ধতির বিষয় অবগত ছিলেন, কারণ তাঁরা প্রায় বছর দশেক যাবৎ প্যারাস্যুট ছাড়া এরূপ বর্মাবৃত ক্যামেরা ব্যবহার করে আসছেন।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের বাতাসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে রাশিয়ানরা একরকম রকেট ব্যবহার করতো। এই রকেট ৩৫ থেকে ৫০ মাইল উপরে উঠে বিভিন্ন সময়ের জন্যে টাইম-ফিউজ দেওয়া ১১ পাউণ্ড ওজনের পাঁচটা ধূম-উৎপাদক বোমা নিক্ষেপ করতো। বোমাগুলি পর পর রকেট থেকে নিষ্ক্রান্ত হতো এবং টাইম ফিউজের জন্যে একই সময়ে বিস্ফোরিত হয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করতো। ভূপৃষ্ঠ থেকে ছোট ছোট টেলিস্কোপের সাহায্যে ধোঁয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করে রাশিয়ানরা ঊর্ধ্বাকাশে বাতাসের অবস্থা নির্ভুলভাবে জানতে পেরেছে বলে দাবী করেছে।

রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র

বলশেভিক বিপ্লবের চত্বারিংশৎ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে কতকগুলি রকেট প্রদর্শিত হয়েছিল, রাশিয়ানরা তখন কিন্তু এ-বিষয়ে তাদের সামরিক গুপ্ত তথ্যাদি কিছুই প্রকাশ করে নি। রকেট সম্বন্ধে যাঁরা কিছু জানেন, তাঁরা দেখবামাত্রই বুঝতে পারতেন যে, ট্রেলারের উপর রক্ষিত বড় বড় ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভি-টু রকেটেরই কতকটা বর্ধিত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তাদের চেয়ে ছোট ছোট যেগুলিকে দেখানো হয়েছিল, সেগুলি মার্কিন নৌ-বাহিনীর বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র টেরিয়ারের মত ঠিক একই ধরণের।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাশিয়ানরা কোন গোপন তথ্যাদি প্রকাশ না করলেও নানাভাবে তাদের অস্ত্রাগারের ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারা গিয়েছিল, তারা কি তৈরী করেছিল, কেন তৈরী করেছিল এবং সেগুলি দিয়ে কি করেছিল—এসব বিষয় জানতে হলে আমাদের বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের বছরে ফিরে যেতে হয়। তখন অনেক আমেরিকানই স্ট্যালিনগ্র্যাডের যুদ্ধের চলচ্চিত্র দেখেছে। সে সময়ে পরিবেষ্টিত জার্মান সেনাদলের বিরুদ্ধে বড় বড় রকেট ছুঁড়তে দেখা গিয়েছিল, সে কথা বোধহয় তাদের স্মরণ আছে! কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সেই রকেটগুলির অধিকাংশই তৈরী হয়েছিল টেনেসিতে এবং সেগুলি দেনা-পাওনা চুক্তির অন্তর্গত যুদ্ধাস্ত্র।

আজকাল যে অর্থে ক্ষেপণাস্ত্র, অর্থাৎ 'মিজাইল' কথাটা ব্যবহৃত হয়, এই রকেটগুলি কিন্তু সেরকমের ক্ষেপণাস্ত্র ছিল না। সেগুলি

ছিল সাধারণ রকমের আঘাতকারী অনিয়ন্ত্রিত রকেট মাত্র। রাশিয়ানদেরও নিজেদের তৈরী ঠিক একই রকমের সওয়া তিন ইঞ্চি ব্যাসের ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী রকেট ছিল এবং সেগুলি ষ্ট্যালিন অর্গ্যান—এই ছদ্মনামে পরিচিত ক্ষেপণ-মঞ্চ থেকে নিক্ষিপ্ত হতো। যুদ্ধের ঠিক পরেই রাশিয়ানরা এই শ্রেণীর আরও দুটি অতিরিক্ত রকেট পাইকারী হারে উৎপাদন করা সুরু করে। এদের মধ্যে ছোটটির ব্যাস ৫ ইঞ্চি এবং বড়টির ব্যাস পৌনে বার ইঞ্চি।

তখনকার দিনের এই শ্রেণীর রকেট থেকেই বর্তমানে প্রচলিত রাশিয়ার আঘাতকারী রকেটের উৎপত্তি হয়েছে। তিন মাইল থেকে পাঁচ মাইল পাল্লার এই শ্রেণীর দু-রকম রকেট আছে। এদের মধ্যে বড়টির ব্যাস হচ্ছে ৫.২ ইঞ্চি। প্রায় এক ফুট ব্যাসের বড় রকেটটিকে এরোপ্লেন থেকে শত্রুপক্ষীয় প্লেনের উপর নিক্ষেপ করবার উপযোগী করে পরিবর্তিত করা হয়েছে। এর গতিপথ এখন অবশ্য ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই নিয়ন্ত্রন-কৌশল কিভাবে কার্যকরী হয়, সেকথা অবশ্য প্রকাশ করা হয় নি। এর রাশিয়ান নাম হচ্ছে—এম-১০০এ, (M-100A.)। এ পর্যন্ত যে সব রকেটের কথা বলা হলো, সেগুলি সবই কঠিন জ্বালানীর সাহায্যে চালিত হয়।

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ানরা জার্মানদের কয়েক টন ওজনের দলিলপত্র হস্তগত করে। তারা ভি-২ ফ্যাক্টরীর রকেট উৎপাদনকারী ইঞ্জিনিয়ারদের বন্দী করে; কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়নকারী এবং গবেষণাকারী কর্মীদের বন্দী করতে পারে নি, যেহেতু তাঁরা সময়মত পলায়ন করে আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। রাশিয়ানরা এছাড়া হয়তো কিছু রকেটও দখল করেছিল। এসব দলিলপত্র থেকে রাশিয়ানরা জানতে পারে যে, জার্মানরা ভি-টু

রকেটে ডানা জুড়ে তার পাল্লা ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করবার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। তাদের এই পরিকল্পনা থেকে বুঝা যায়—ডানা জুড়ে দিলে ১০০ মাইল পাল্লার ভি-টু রকেট তার ঊর্ধ্বগতির শেষ সীমা ৬০ মাইল পর্যন্ত উঠে আবার নীচের দিকে অবতরণ করবার সময় ঘন বায়ুস্তরে প্রবেশ করে গ্লাইডারের মত ডানায় ভর করে আরও প্রায় ১০০ মাইল বেশী এগিয়ে যেতে পারবে। অবশ্য চালক না থাকলে এরূপ রকেটের পক্ষে সঠিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব নয়, কাজেই জার্মানরা এরূপ পরিকল্পনা করেছিল যে, চালক যখন দেখবে, গতিপথ ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং রকেট অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করবে, তৎক্ষণাৎ সে রকেট থেকে বেরিয়ে আসবে। জার্মানদের দলিলপত্র থেকে রাশিয়ানরা একথাও জানতে পেরেছিল যে, সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যে জার্মানরা কঠিন জ্বালানী-চালিত রকেট নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল। যেহেতু 'জার্মানরা কেবল খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করেই এসব অভিনব অস্ত্রাদি নির্মাণের পরিকল্পনা করে নি—ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নিখুঁৎ তাত্ত্বিক ভিত্তির উপরই সেগুলি রচিত হয়েছিল, সেহেতু রাশিয়ানরা সে সব দলিল-পত্রাদি অনুসরণ করে নিজেদের লোকজনের সাহায্যেই তদনুরূপ যন্ত্রাদি নির্মাণে সক্ষম হয়েছিল। এখন সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপ করবার মত কঠিন জ্বালানী-চালিত ক্ষেপণাস্ত্রের নির্মাণকার্য চলছে। এদের মধ্যে একটি হবে—১০০ মাইল পাল্লার কমেট-১ ; আর একটি হবে ৫০০ মাইল পাল্লার কমেট-২।

রাশিয়ানরা যে জার্মান ভি-টু রকেট নির্মাণ করেছে, তার নাম দিয়েছে তারা টি-ওয়ান ও এম-১০১। এর ব্যাসের মাপ মূল ভি-টু-এর সমান, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ ফুট ; কিন্তু লম্বায় ৫০ ফুট (ভি-টু ছিল প্রায় ৪৬ ফুট লম্বা) এবং এর জ্বালানীও আলাদা—অর্থাৎ

অ্যালকোহলের পরিবর্তে কেরোসিন। এর পাল্লার কথা বলা হয়েছে ৪০০ মাইল—মূল ভি-টু-এর পাল্লার দ্বিগুণ। এটি এখনি তৈরী হচ্ছে। টি-ফোর (বা এম-১০২) নামক ডানাওয়ালা সংস্করণটিরও নির্মাণকার্য চলছে। এর পাল্লা ১০০০ মাইলের মত হতে পারে বলে তারা দাবী করছে—যদিও এই দাবী কতকটা অতিশয়োক্তির মত শোনায়। সম্ভবতঃ এই পরিমাপটা ১০০০ মাইল না হয়ে ১০০০ কিলোমিটার হবে—যাতে ৬২০ মাইলের কিছু বেশী হতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক বলে ধরা যায়। কারণ পাল্লা ৬০০ মাইলের উপরে হলে তাকে দুই অথবা তিন পর্যায়ী রকেট হতে হবে। টি-টু ক্ষেপণাস্ত্র (এম-১০০ নামেও পরিচিত) হলো ১৫০০ মাইল পাল্লার রাশিয়ার আই-আর—বি-এম (মাঝামাঝি পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র)। এর অন্ততঃ ১০০টি পরীক্ষামূলকভাবে হয়েছিল। এগুলি হচ্ছে তরল জ্বালানী-চালিত দু-পর্যায়ী ক্ষেপণাস্ত্র। এদের উর্ধ্ব-যাত্রার প্রারম্ভিক ওজন প্রায় ৮৫ টন। এই দুটি পর্যায়ের উপরেরটি হলো টি-ওয়ান রকেট, আর নীচেরটি হলো বেশ ভারী একটি বুষ্টার অর্থাৎ উৎক্ষেপক। সম্ভবতঃ প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিককে উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করবার সময় টি-টু রকেটকেই কৃত্রিম উপগ্রহটির পরিবাহকরূপে পরিবর্তিত করা হয়েছিল।

টি-৭এ নামে রাশিয়ার আর একটি রকেট ক্ষেপণাস্ত্রের নির্মাণ-কার্য চলছে। কঠিন জ্বালানী-চালিত এই রকেটটি লম্বায় ২৫ ফুট এবং আড়াআড়িভাবে আড়াই ফুট। এর পাল্লা হচ্ছে ৬০ মাইল। রাশিয়ার এই টি-৭-এ রকেটটি আমেরিকার তরল জ্বালানী-চালিত করপোর্যাল ক্ষেপণাস্ত্রের সমকক্ষ।

এ পর্যন্ত রাশিয়ার আই-সি-বি-এম, অর্থাৎ আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র তথ্য জানা গেছে যে, এটির নাম

দেওয়া হয়েছে—টি-থি অথবা এম-১০৪ এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে ৫০০০ মাইল পাল্লা। এর দুটি কি তিনটি মাত্র পরীক্ষামূলক ভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই তিন পর্যায়ী রকেট এবং এর অগ্রভাগে ইউরেনিয়াম বা হাইড্রোজেন বোমা থাকবে বলে খুব ভারী হবারই কথা। কারণ এত অধিক দূরত্বে সাধারণ উগ্রবিস্ফোরক নিক্ষেপণে খরচের দিক থেকে মোটেই সুবিধা হবে না। সম্ভবতঃ টি-থি রকেটের পরিবর্তিত সংস্করণের সাহায্যেই ২নং স্পুটনিক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেটি খুবই সরল। আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে রাশিয়া আমেরিকার তুলনায় কিছুটা এগিয়ে আছে; কিন্তু মাঝারী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের (আই-আর-বি-এম) ক্ষেত্রে সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র

একথা শুনে অনেকেই বিস্মিত হবেন যে, আমেরিকাই সর্বপ্রথম ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করেছিল এবং এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত জার্মান ক্ষেপণাস্ত্রের বহু পূর্বে। 'দি বাগ' এই ছদ্মনামে পরিচিত প্রথম আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লং আইল্যাণ্ডে তৈরী হয়। কিন্তু অস্ত্রটা ব্যবহার করা হয় নি।

একথা এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা উচিত যে, রকেট আর ক্ষেপণাস্ত্র মোটেই এক জিনিষ নয়, যদিও জনসাধারণের এই রকমের একটা ধারণা আছে বলে মনে হয়। যাকে শত্রুর প্রতি

নিক্ষেপ করা যায়, সামরিক ভাষ্যে তাকেই 'মিজাইল' বা ক্ষেপণাস্ত্র বলা হয় অথবা এ-ও হতে পারে—নির্দেশমত নিজে নিজেই যে অস্ত্র শত্রুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়, তাকেই ক্ষেপণাস্ত্র বলা যেতে পারে। এই অস্ত্র কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয় না, নিজেই চলে অর্থাৎ স্বয়ং চালিত। কিন্তু কেমন করে স্বয়ংচালিত হয়, ক্ষেপণাস্ত্রের সংজ্ঞার মধ্যে তার কোন কথা নেই ; তবে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্রকে অবশ্য রকেটের পদ্ধতিতেই পরিচালিত করা হয়। পরিচালক বস্তুটা অবশ্য জেট ইঞ্জিন অথবা প্রোপেলার যুক্ত সাধারণ এরোপ্লেন ইঞ্জিনও হতে পারে। বাগ নামক ক্ষেপণাস্ত্রটা ছিল এই ধরণের। আজ-কাল যাকে উড়ন্ত বোমা বলা যায়, বাগ ছিল সে রকমের একটা বস্তু। পাওয়ার প্ল্যান্ট ছিল তখনকার সব চেয়ে নির্ভর যোগ্য এরোপ্লেন-ইঞ্জিন। তার পাল্লা ৪০০ মাইলের মতও হতে পারতো, কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা ছিল খুবই কম।

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি বাগকে কার্যোপযোগী করা হলো ; কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই সবাই জানতে পারলো যে, কয়েক মাসের মধ্যেই যুদ্ধের অবসান ঘটবে। কাজেই এর আর উৎপাদন করা হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রও ও কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করেছিল। এদের বেশীর ভাগই তৈরী করেছিল আর্মি এয়ার কোরের একটি বিভাগ। যার নাম লোকে চুপি চুপি বলতো—পি-এ-ডি অর্থাৎ, চালকবিহীন বিমান বিভাগ Pilotless Aircraft Division। নৌ-বাহিনীরও পি-এ-ডি-'র অনুরূপ একটি বিভাগ আছে। একটি আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র প্রশান্ত মহাসাগরে কাজে লাগানো হয়েছিল যার নাম ছিল 'ব্যাট'। ব্যাট হলো দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত ছোট এক

রকমের উড়ন্ত বোমা। আমেরিকান বোমারু বিমান থেকে এগুলি জাপানী জাহাজের উপর নিক্ষিপ্ত হতো। নাম থেকে সাধারণতঃ যেমন ধারণা হয়, এই ক্ষেপণাস্ত্রটির তেমন কোন পরিচালন ব্যবস্থা ছিল না। অতি দ্রুত ধাবমান এরোপ্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে অর্জিত ভরবেগের প্রভাবেই যান্ত্রিক কৌশলে পরিচালিত হয়ে বোমাটা প্রচণ্ড বেগে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বভাবতঃই বিরতি ঘটে। এ-সম্বন্ধে জার্মানদের বিরাট অগ্রগতি প্রথমে আয়ত্ত করা প্রয়োজন ছিল। আরও অধিক সংখ্যক লোকের এসব নতুন নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কৌতূহলের বিষয় এই যে, যেসব জার্মান রকেট-বিজ্ঞানীরা ডাঃ ওয়ার্নার ভন ব্রাউনের অধীনে কাজ করছিলেন, তাঁদের একটা প্রধান অভিযোগের বিষয়ই ছিল এই যে, তাঁরা নাকি এমন একজন লোকও পেতেন না যার সঙ্গে এসব বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করা যায়।

কিন্তু ধীরে ধীরে এ বিষয়ে ধারণা এবং কর্মপদ্ধতি একটা আকার পরিগ্রহ করতে সুরু করলো। অনেকেই একথা অনুধাবন করলো যে, ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে কয়েকটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীভুক্ত করা প্রয়োজন। এক শ্রেণীতে থাকবে বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র—যে-গুলিকে যুদ্ধ জাহাজ বা ভূমির উপর থেকে এরোপ্লেনের প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। আজকাল এই শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্রের সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হলো নাইক অ্যাজাক্স। নাইক অ্যাজাক্স হলো ২০ ফুট লম্বা তরল জ্বালানী-চালিত রকেট। কঠিন জ্বালানীর সাহায্যে চালিত ১৫ ফুট লম্বা উৎক্ষেপকের (বুষ্টারের) সাহায্যে নাইক অ্যাজাক্স উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। হেলানোভাবে আকাশে উঠে গিয়ে নাইক অ্যাজাক্স প্রায় ২২ মাইল দূরবর্তী এরোপ্লেনকে আঘাত

করতে পারে। এতটা দূরে ছুটে যেতে অ্যাজাক্সের প্রায় ১০০ সেকেণ্ড সময় লাগে। 'নাইক হারকিউলিস' নামে আর একরকমের ক্ষেপণাস্ত্র নাইক অ্যাজাক্সের অনুরূপ হলেও আকারে বৃহত্তর এবং তার পাল্লা প্রায় ৫০ মাইলের মত। 'নাইক জিয়াস' নামে আর একরকমের ক্ষেপণাস্ত্রের (যার নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয় নি) পাল্লা এত বেশী হবে যে, সেটা গতিশীল অন্য যে কোন ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারবে। নাইক অ্যাজাক্সের মত নৌ-বাহিনীরও 'টেরিয়ার' নামে ২৭ ফুট লম্বা একরকম ক্ষেপণাস্ত্র আছে। টেরিয়ার এবং তাকে উপরে উঠিয়ে দেবার বুষ্টার (উৎক্ষেপক)—উভয়েই কঠিন জ্বালানীর সাহায্যে পরিচালিত হয়। এর পাল্লা প্রায় ২০ মাইলের মত।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আকাশ থেকে আকাশেই নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এগুলি এক এরোপ্লেন থেকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে অপর এরোপ্লেনের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবার বিভিন্ন পদ্ধতি হিসাবে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের কয়েকটিকে বলা হয়—'হোমিং মিজাইল' অর্থাৎ এই ধরণের ক্ষেপণাস্ত্রকে শত্রু-বিমানের দিকে মোটামুটি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয়। এর মধ্যে এমন একরকম যান্ত্রিক কৌশলের ব্যবস্থা আছে যে, শত্রু-বিমান থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদিত কোন কিছু—যেমন ইঞ্জিনের শব্দ বা পরিত্যক্ত উত্তপ্ত গ্যাসের স্পর্শেই সেটা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ক্ষেপণাস্ত্রটিকে সেই উত্তাপ বা শব্দের উৎসের দিকে পরিচালিত করে। ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা 'ফ্যালকন' এবং ৯ ফুট লম্বা 'সাইড উইণ্ডার' নামে এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন দু-রকমের কার্যকরী ক্ষেপণাস্ত্র আছে। কিন্তু ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা 'স্প্যারো' নামে পৃথক রকমের

ক্ষেপণাস্ত্র আছে, যেগুলি সাধারণতঃ তথাকথিত 'বিম-রাইডার' (নাইক ও টেরিয়ারের মত) নামে পরিচিত। 'বিম-রাইডার' কথাটার অর্থ হলো—ক্ষেপণাস্ত্রগুলি এমনভাবে তৈরী যে, চলবার সময় তারা রাডারের রশ্মি-পথের মধ্যেই থাকে; কোন কারণে রশ্মি-পথের বাইরে চলে গেলেও সেই পথেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কাজেই রাডার-রশ্মির মত বিম-রাইডার ক্ষেপণাস্ত্রও লক্ষ্য বস্তুকে অনুসরণ করে থাকে।

তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মাটিতে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেগুলিকে উপর থেকে নীচে ভূমির উপর অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর নিক্ষেপ করা হয়, সেগুলি এরূপ একটা উপবিভাগের অন্তর্গত। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে এরোপ্লেনে করে উপরে তুলে নিয়ে সেখান থেকে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত অথবা সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ প্রভৃতি লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমার মত ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে অবশ্য দিক অথবা গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। এর মধ্যে 'ডার্ট' নামক ক্ষেপণাস্ত্রটিই সবচেয়ে ছোট। লম্বায় এগুলি প্রায় ৬ ফুটের মত। এগুলি কঠিন জ্বালানীর রকেটের সাহায্যে পরিচালিত হয় এবং এদের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয় পিছন দিকে সংলগ্ন তারের সাহায্যে। ডার্টের পাল্লা মাত্র তিন মাইল। এগুলিকে ট্রাক থেকে—বিশেষ করে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা যায়। উপর থেকে নীচে আঘাত করবার জন্যে 'রাসক্যাল' নামে ৩৫ ফুট লম্বা অদ্ভূত ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ঠিক এরোপ্লেনের মত দেখায়। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর প্লেনের সাহায্যে একে উপরে তুলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তরল জ্বালানীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেটা এত উঁচুতে উঠে যায়

যে, রকেট-পরিচালিত নয় এমন কোন কিছুই সেখানে তাকে অনুসরণ করতে পারে না। তারপর সেই উঁচু জায়গা থেকে ঠিক খাড়াভাবে লক্ষ্যবস্তুর উপর পতিত হয়।

ভূমি থেকে ভূমির উপরে কোন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবার জন্যে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি দ্বিতীয় উপবিভাগের অন্তর্গত। টার্বো-জেট ইঞ্জিন পরিচালিত সত্যই চালকবিহীন এরোপ্লেনের অস্তিত্ব আছে। তার মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত 'মাটাডোর' নামক প্লেনগুলি লম্বায় প্রায় ৪৬ ফুট এবং তাদের ডানার মাপ প্রায় ২৯ ফুটের মত হয়ে থাকে। কঠিন জ্বালানী-চালিত উৎক্ষেপক, মাটাডোরের টি-৩৩ টার্বো-জেট ইঞ্জিনকে ভূমি ছেড়ে উপরে ওঠবার সময় সাহায্য করে। এর পাল্লা প্রায় ৬০০ মাইল। এর চেয়ে অনেক বড় 'স্নার্ক' নামক ক্ষেপণাস্ত্রটি লম্বায় ৭৪ ফুট এবং এর ডানার বিস্তার হলো ৪২ ফুট। ১১,০০০ পাউণ্ড ধাক্কা প্রদানে সক্ষম জে-৫৭ টার্বো-জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে স্নার্ক পরিচালিত হয়। ৩৩,০০০ পাউণ্ড ধাক্কা উৎপাদনে সক্ষম কঠিন জ্বালানী-চালিত দুটি উৎক্ষেপক রকেট (বুষ্টার) স্নার্ককে প্রথমে উপরে উঠে যেতে সাহায্য করে। স্নার্ক হলো ৫০০০ মাইল পাল্লার আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র।

সর্বশেষ তৃতীয় উপবিভাগের মধ্যে পড়ে চোখ-ধাঁধানো (শত্রুর চোখে বিভ্রান্তিকর) দূরপাল্লার ব্যালিষ্টিক মিজাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র-সমূহ। অবশ্য এর মধ্যে 'ল্যাক্রোসি'র মত ১০ মাইল পাল্লার অস্ত্রও আছে। এর পরেই হচ্ছে ৪৫ ফুট লম্বা, ৩০ ইঞ্চি চওড়া তরল জ্বালানী-চালিত সরু কর্পোরাল রকেট। কর্পোর্যালের পাল্লা ৫০ মাইল। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি নাকি অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী। কিন্তু 'সার্জেন্ট' নামক একপ্রকার ক্ষেপণাস্ত্র নাকি কর্পোর্যালের স্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সার্জেন্ট কর্পোর্যালের চেয়ে কতকটা ছোট, কিন্তু উভয়েরই

পাল্লা প্রায় সমান। এটি হলো কঠিন জ্বালানী-চালিত রকেট এবং মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই একে উৎক্ষেপনের জন্যে প্রস্তুত করা যায়।

পাল্লা অনুযায়ী রেডষ্টোন রকেট (সাড়ে ৬৯ ফুট লম্বা, ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি চওড়া, উৎক্ষেপণ-কালীন ওজন ৪০,০০০ পাউণ্ড) নিকট পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মাঝারী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যবর্তী। এর পাল্লা পুরনো ভি-টু-এর মত ২০০ মাইলের মধ্যে। কিন্তু এই ক্ষেপণাস্ত্রটি কয়েক টন ওজন নিয়ে চলতে পারে। জ্বালানী ফুরিয়ে গেলেই নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ও বিস্ফোরক পূর্ণ রেডষ্টোনের অগ্র-ভাগটি প্রধান অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তখনও নীচু দিকে চলবার মুখে যান্ত্রিক কৌশলে আপনা থেকেই নির্ধারিত গতিপথে কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারে।

এর পরের বৃহত্তর ধরণের ক্ষেপাণাস্ত্র হলো—আই-আর-বি-এম অর্থাৎ মাঝারী পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। এখানে মাঝারী পাল্লার অর্থ হচ্ছে-প্রায় ১৫০০ মাইল। কিন্তু আই-আর-বি-এম শ্রেণীর 'থর' নামক ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রায় ৩০০০ মাইল উড়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে। এতটা দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম বলে তাকে আই-সি-বি-এম, অর্থাৎ আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের শ্রেণীতে অথবা তার কাছাকাছি কোন শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। আমেরিকার অস্ত্রাগারে তিন রকমের আই-আর-বি-এম শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র আছে। বিমান বাহিনীর থর এবং সেনা-বাহিনীর জুপিটারের নীচের দিকের বেশীর ভাগ রকেটই তরল জ্বালানীর দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু উপরের দিকের রকেটগুলি চলে কঠিন জ্বালানীর সাহায্যে। নৌ-বাহিনীর পোলারিজ ক্ষেপণাস্ত্র থর এবং জুপিটারের চেয়ে অনেক ছোট (ব্যাসের মাপ অবশ্য বেশী) এবং

সেগুলি সম্পূর্ণরূপে কঠিন জ্বালানীর সাহায্যেই চালিত হয়। এগুলিকে ছোট এবং বেশী মোটা করবার কারণ এই যে, থর ও জুপিটার শ্রেণীর রকেটগুলি ৭৫ ফুটের মত লম্বা হয়ে থাকে। কিন্তু জাহাজের উপর অত বড় জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করা অসম্ভব বললেই হয়।

আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে লম্বায় সবচেয়ে বড় হলো 'অ্যাটল্যাস'। অ্যাটলাস হলো আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। মাটি ছেড়ে প্রথমে উপরে ওঠবার জন্যে দুটি অতিরিক্ত উৎক্ষেপক (বুষ্টার) একে সাহায্য করে। যাহোক, ভি-টু যেমন তার চেয়ে বৃহত্তর রেডষ্টারের অগ্রদূত, রেডষ্টোনও তেমনি জুপিটারের অগ্রদূত। এরূপেই ক্রমশঃ একটা থেকে আর একটার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল এবং অ্যাটলাসও সেরূপ একদিন ভবিষ্যৎ বিশাল আকৃতির রকেটের ক্ষুদ্রতর অগ্রদূতরূপে পরিগত হবে। এই বিশাল আকৃতির ভবিষ্যৎ রকেট অবশ্য আর ক্ষেপণাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবে না—সে হবে তখন "স্পেসসিপ" বা মহাশূন্য-যান।

আই. সি. বি. এম-এর ত্রুটি

সামরিক চিন্তাধারা আজকাল এমন তাড়াতাড়ি বদ্‌লে যাচ্ছে যে, সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বিশেষজ্ঞেরা পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

এই সেদিনও আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, আই-সি-বি-এম 'চরম অস্ত্র' বলে বিবেচিত হতো এবং কেউ যদি বলে—যেমন অনেক সামরিক লোকেরাও বলেছেন যে, 'চরম অস্ত্র' ছাপটা (মার্কা) ইতিপুর্বে 'অ্যাটম বোমাতে'ও প্রযুক্ত হয়েছিল এবং তারও আগে ট্যাঙ্ক, মেসিন গান, উগ্র বিস্ফোরক কামানের গোলা এবং 'ক্রশ-বো'

প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতো, তবে তার উত্তরে বলা হতো—'দূর পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে তোমরা তো কিছুই করতে পার না!'

এ সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়েই বলা দরকার যে, যাকে চরম অস্ত্র বলে ধরা হয়েছে—সেটা হচ্ছে, আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, অর্থাৎ দূর পাল্লার রকেট যা বায়ুমণ্ডলের বাইরে উর্ধ্বাকাশে বৃত্তাংশের ন্যায় সুবৃহৎ বক্রপথ রচনা করে উৎক্ষেপণ স্থল থেকে লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এই আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে অতি দূর পাল্লার আরোহীবিহীন এক রকম জেট বিমান বলা চলে তাকে যে অধিকতর দ্রুতগতিসম্পন্ন মনুষ্যবাহী জেট বিমানের দ্বারা ভূপাতিত করা যায়, সাধারণতঃ সেকথা স্বীকৃত। কিন্তু ব্যালিষ্টিক' ব্যাপারটা? না—তা কখনও হয় নি!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভি-টু রকেটের বৃত্তাংশের মত গতিপথের শেষপ্রান্তের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই বদ্ধমূল ধারণা গড়ে উঠেছিল। বড় বড় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের এই প্রাথমিক রকেটগুলির ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে পাল্লা ছিল ২০০ মাইলের সামান্য কিছু কম। এই দূরত্ব অতিক্রম করবার জন্যে এই রকেটগুলি উৎক্ষেপণ-স্থল ও সংঘাত-স্থলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ৬০ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠতো এবং ঘন্টায় ১৮০০ মাইল বেগে ছুটে গিয়ে ভীষণ শব্দে লক্ষ্যস্থলে ফেটে পড়তো। মধ্যবর্তী এই উচ্চতম বিন্দু থেকে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছুতে সময় লাগতো মাত্র ১৭০ সেকেণ্ড, অর্থাৎ পুরো তিন মিনিটও নয়।

যদিও বা রাডারের সাহায্যে ক্ষেপণাস্ত্রের আগমণ-বার্তা জানা যেত, তথাপি তিন মিনিট সময়ের মধ্যে কারো পক্ষে কিছু করা সম্ভব হতো কি? স্পষ্টই বোঝা যায়—কিছুই করা সম্ভব হতো না।

কিন্তু একথা বলা হয়েছে যে, ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের আন্ত-র্মহাদেশীয় পাল্লার ক্ষেত্রে ব্যাপার কতকটা ভিন্ন রকমের। ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পক্ষে ৫০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট সময় লাগবে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ক্ষেপণাস্ত্রটি গতিপথের ঠিক মধ্যবর্তী স্থলে সর্বাধিক উচ্চতায় উঠবে। এই উচ্চতা হবে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হতে ৮০০ থেকে ১০০০ মাইলের মধ্যে। ক্ষেপণাস্ত্রটাকে যখন অতটা উচ্চতায় উঠতে হবে, তখন রাডারের পক্ষেও তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি তার অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব হবে না। ধাবমান ক্ষেপণাস্ত্রটা গতিপথের মধ্য বিন্দু অতিক্রম করবার পরক্ষণেই—ধরুন, প্রায় ১৫০০ মাইল দূরে থাকতেই লক্ষ্যের বিষয়ীভূত সহরে স্থাপিত রাডার তাকে দেখতে পাবে। এর অর্থ—ক্ষেপণাস্ত্রটা লক্ষ্যস্থলে আঘাত করবার প্রায় ৯-১০ মিনিট পূর্বেই রাডার তার আগমনের কথা জানতে পারবে।

রাডার যন্ত্রটি যদি ১৫০০ মাইল দূরের জিনিষ দেখবার মত শক্তিশালী হয় তবে সংঘর্ষ ঘটবার ১০ মিনিট পূর্বেই ক্ষেপণাস্ত্রটা রাডারের দৃষ্টিপথে আসবে। আধুনিক রাডারের পাল্লা সম্ভবতঃ এত বেশী নয়; তাছাড়া (এতদিন) অত দূর পাল্লার রাডারের প্রয়োজনও ছিল না। বর্তমানে দূর পাল্লার রাডারের অস্তিত্ব নেই—এতে একথা বুঝায় না যে, এ রকমের দূর পাল্লার রাডার যন্ত্র তৈরী করা যায় না। ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উর্ধ্বাকাশের মধ্য দিয়ে ছুটে যাবার সময় কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলার মত গতিপথ এক আধটুকু পরিবর্তন করতে পারে বটে, কিন্তু রাডারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়গুলিকে কম্পিউটার যন্ত্রে ফেলে একমিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে কতকগুলি বিষয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথের বক্রতা, লক্ষ্যস্থল এবং সংঘাত ঘটবার সময়

বলে দিতে পারে। এমন কি, কোন্ জায়গা থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তারও প্রায় সঠিক নির্দেশ দিতে পারে। ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যাটারী চালকদের পক্ষে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।

ট্র্যাজেক্টরী অর্থাৎ গতিপথের বক্রতা জানা থাকলে ধাবমান ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক অস্ত্রের গতিপথের কতটা বক্রতার প্রয়োজন হবে, তা হিসেব করে বার করা যায়। কথাটা হচ্ছে—প্রতি-রোধক অস্ত্রের ভূমি থেকে উপরে ওঠবার যথেষ্ঠ সময় থাকা চাই এবং আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্র যে বক্রপথে আসছে, তাকে ঠিক সেই বক্রপথেই পৌঁছুতে হবে। একই বক্রপথে ধাবিত হলেও তার গতি হবে অবশ্য বিপরীত দিকে এবং ভূমি থেকে বেশ কিছু দূরে পরস্পরের মিলন অর্থাৎ সংঘর্ষ ঘটা চাই। পরিষ্কারই বোঝা যায়, আক্রমণকারী আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অগ্রভাগে বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে থার্মো-নিউক্লিয়ার অস্ত্র অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন বোমা থাকবে। কারণ এর চেয়ে কম শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করলে খরচা পোষাবে না। ত্রিশ মাইলের বেশী দূরে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হলে সেটা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক হবে। কাজেই প্রতিরোধকারী অস্ত্রকে লক্ষ্যস্থল থেকে ৬০ মাইল বা ৮০ মাইল দূরে থাকতেই আক্রমণকারীকে উড়িয়ে দিতে হবে।

কেমন করে কাজটা হবে, তার কতকটা অন্ততঃ নির্ভর করে আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরক রাখবার অংশের গঠন-কৌশলের উপর। যদি বিস্ফোরক পদার্থের ফিউজ সামনের দিকে থাকে তবে যে কোন একটা কিছু সামনে ছুঁড়ে দিলেই ফিউজে প্রতিক্রিয়া সুরু হবে এবং তার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। আর যদি এতে 'টাইম-ফিউজ' অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে ফিউজ সক্রিয় হয়ে উঠবার

ব্যবস্থা থাকে তাহলে আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রকে ঘিরে ফেলবার জন্যে প্রতিরোধকারী অস্ত্রের অগ্রভাগে পারমাণবিক বিস্ফোরক ব্যবহার করতে হবে। মোটের উপর আক্রমণকারীকে এমনভাবে জখম করা দরকার যে, তার বিস্ফোরকপূর্ণ অগ্রভাগটি যেন আর কার্যকরী না হয়। আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রের অনিষ্টকারী ক্ষমতা কেমন করে নষ্ট করা যায়, সেই সমস্যাটাই প্রথম বিবেচ্য বিষয় নয়। সব চেয়ে জরুরী সমস্যা হলো এই যে, আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রের আগমণ টের পাওয়ার পর প্রতিরোধকারী ক্ষেপণাস্ত্রকে তার ঠিক আগমণ-পথে পৌঁছে দেবার মত যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে কিনা?

এখন এটা সম্ভব বলে মনে হয় এবং আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রতিরোধকারী ক্ষেপণাস্ত্র উভয়ের যদি প্রায় একই সময়ে উন্নতি সাধিত হয়, তবে সেটাও তেমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃত্রিম উপগ্রহ

হেইল থেকে এক্সপ্লোরার

আকাশে উপগ্রহ

স্পুটনিক হঠাৎ যেদিন মহাকাশ থেকে বিপ্‌ বিপ্‌ শব্দ পাঠাতে সুরু করেছিল—প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৫৭ সালের সেই ৪ঠা অক্টোবর থেকেই মহাকাশের যুগ সুরু হয়েছে কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলতে পারে এবং সম্ভবতঃ চলবেও। কেউ কেউ বলতে চাইছেন যে, ইতিহাসের সর্বপ্রথম রকেট যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে ২৫০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠেছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দিন থেকেই মহাকাশ-যুগ সুরু হয়েছিল। সেই তারিখটা ছিল ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এবং রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস্‌ প্রুভিং গ্রাউণ্ড থেকে। কেউ কেউ আবার এ-কথার উপরও জোর দিতে পারেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে মহাকাশ-যুগ আরম্ভ হয়েছিল তখন থেকেই, যখন মহাকাশে অভিযান সম্ভব বলে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু যখন রকেট ও মহাকাশ গবেষণা নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এ-ধরণের আলোচনায় ব্যাপৃত, তখন স্পুটনিকের মহাকাশে উৎক্ষেপণ যে অধিকাংশের মতেই মহাশূন্য-যুগের সুরু বলে বিবেচিত হবে এতে কোনই সন্দেহ নেই, তারা ত্রিশ বছর আগেকার প্রকাশিত এই নিবন্ধগুলির কথা শোনেনি, সেগুলির অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় রচিত হয়নি। আবার ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঐতিহাসিক ঘটনাটির কথাও গোপন রাখা হয়নি—তথাপি সেই ঘটনাটি যে কেন গুরুত্বপূর্ণ, সে নিয়ে তখন খুব কম লোকই মাথা ঘামিয়েছিল। বিগত দশ বছর ধরে কৃত্রিম উপগ্রহের কথা এবং তার জন্যে বৈজ্ঞানিকরা অর্থ ও লোকবলের আবেদন জানিয়ে আসছিলেন বটে, কিন্তু মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন সম্ভব—একথা শোনা, আর একটি সর্ট-ওয়েভ সেটের সুইচ টিপে ৫০০ মাইল উপর থেকে রেডিও-সঙ্কেত শোনবার মধ্যে পার্থক্য অনেক।

কি করা যায় এবং কি করা উচিত—সে নিয়ে আলোচনা শেষ হয়ে গেছে।

কাজটি করা হয়ে গেছে এবং করা হয়েছে এমন ভাবে যাতে সবাই দেখতে এবং শুনতে পারে।

কিন্তু কেমন করে কাজটি করা সম্ভব হয়েছে?

একটা কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর চতুর্দিকের কক্ষপথে স্থাপন করবার পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা খুবই সহজ। যা কিছু একটা হোক তাকে যদি পৃথিবীর বাইরে কক্ষপথে পাঠাতে হয় তবে সেটাকে বায়ুমণ্ডলের উপরে তুলে দিতে হবে। তারপর এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সেটা সেকেণ্ডে ৪·৬ মাইল বেগে (অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৬,৫৬০ মাইল বেগে; সাধারণতঃ ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল ধরা হয়,

কিন্তু তা ঠিক নয়) পৃথিবী-পৃষ্ঠের সমান্তরালে ছুটতে পারে এবং তার ফলে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথ রচিত হবে।

পৃথিবীর বাইরে চলে গেলেও একথা মনে করবেন না যে, কৃত্রিম উপগ্রহটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান অতিক্রম করে গেছে। এমন কি, আমাদের চাঁদ ২,৪০,০০০ মাইল দূরে থেকেও পৃথিবীর টান অতিক্রম করতে পারেনি। যদি তাই হতো তবে সে পৃথিবীর চারধারে ঘুরবে কেন? প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানই কক্ষপথ সৃষ্টি করে। একথা বুঝতে হলে—মনে করুন, পৃথিবী কোন কিছুকেই আকর্ষণ করে না। এ অবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহটা যখন বায়ুমণ্ডলের বাইরে রয়েছে তখন তাকে একটা ধাক্কা দিলেই সে সোজা সরল রেখায় চলতে থাকবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আকর্ষণ শক্তি আছে বলে সে তাকে তার দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করবে এবং টেনে আনবেও বটে; কিন্তু টানের ফলে কয়েক ডজন ফুট নামতে না নামতেই সে পৃথিবী-পৃষ্ঠের সমান্তরাল ভাবে বেশ কিছু মাইল দূরে চলে যাবে।

সুতরাং যে গতিবেগে উপগ্রহটি সরল রেখায় ছুটে চলছিল, পৃথিবীর আকর্ষণ তাকে বক্রপথে পরিচালিত করে এবং গতিবেগ যথোপযুক্ত হলে এই বক্রতার ফলেই পৃথিবীর চতুর্দিকে বৃত্তাকার কক্ষপথ রচিত হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের এই পরিকল্পনার বিষয় বেশ কিছুটা সহজ মনে হয় এবং প্রকৃত ব্যাপারটা সহজও বটে। বিষয়টা সম্বন্ধে ধারণা করবার কোন অসুবিধা নেই। অসুবিধা হলো একে কার্যে পরিণত করবার ব্যাপারে এবং আজও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অসুবিধাই হলো—প্রয়োজনীয় উচ্চ গতিবেগ সৃষ্টির ব্যাপারে। ভারী কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা যে গতিবেগে ধাবিত হয়, তার ছয় গুণেরও

বেশী গতিবেগের প্রয়োজন। অথচ একথাও নিশ্চিত যে, মানুষ এমন কোন কামান তৈরী করতে পারেনি, যা এত উচ্চ গতিবেগে গোলা নিক্ষেপ করতে পারে।

রকেটকে অবশ্য কামানের গোলার চেয়ে দ্রুততর গতিসম্পন্ন করা যায়, তাছাড়া রকেটের আরও একটা সুবিধা এই যে, রকেটকে পর্যায়ক্রমিক, আর্থাৎ তথাকথিত ষ্টেপ-রকেটে পরিণত করা যায়। ষ্টেপ-রকেট কথাটার অর্থ হলো—একটা রকেট আর একটা রকেটকে বয়ে নিয়ে যাবে এবং প্রথমটার জ্বালানী ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় রকেটটা সক্রিয় হয়ে উঠবে। আজকালের বড় বড় রকেটগুলির মধ্যে একটি অন্ততঃ কোন কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়েও অনায়াসে সেকেণ্ডে এক মাইল হিসেবে ছুটতে পারে। সেকেণ্ডে দেড় মাইল গতিবেগ অর্জন করতে পারে, এরূপ রকেট তৈরী করাও সম্ভব। সেকেণ্ডে দেড় মাইল বেগে ছুটতে পারে এরকম রকেটের ডগার দিকে যদি অনুরূপ গতিশক্তি সম্পন্ন আর একটা ছোট রকেট জুড়ে দেওয়া যায়, তবে এই দ্বিতীয় রকেটটি ঠিক সময় মত সেকেণ্ডে দেড় মাইল বেগে যাত্রা সুরু করবে। যদি তার নিজস্ব শক্তিবলে ওই গতিবেগ অর্জন করতে পারে তবে তখন সে সেকেণ্ডে ৩ মাইল বেগে ছুটতে থাকবে। যদি দ্বিতীয় রকেটটির উপরে তৃতীয় আর একটি রকেট যোগ করা যায় তবে প্রথম ও দ্বিতীয় রকেট থেকে পাওয়া তিন মাইল গতিবেগের সঙ্গে সেকেণ্ডে আরও দেড় মাইল গতিবেগ বাড়িয়ে দেবে। এ-থেকে সহজেই বুঝা যায়, তিন পর্যায়ের রকেট কেমন করে উপগ্রহের গতিবেগ অর্জন করে।

রাশিয়ানরা কেমন করে স্পুটনিককে উর্ধ্বাকাশে তুলেছিল, সে কথা তারা দুনিয়াকে জানায় নি বটে, কিন্তু তারা স্পুটনিক উৎ-ক্ষেপণের দৃশ্য ফিল্মে দেখাবার কথা বলেছিল। কেমন করে তারা

কাজ করছিল, ফিল্ম থেকে সেটা অনুমান করা অসম্ভব হবে না। একথা জানা গেছে যে, তাদের প্রায় ১৫০০ মাইল পাল্লার এক রকম ক্ষেপণাস্ত্র আছে। সেটা নিশ্চয়ই দু-পর্যায়ী ক্ষেপণাস্ত্র হবে। যেহেতু সেটা একপ্রকারের ক্ষেপণাস্ত্র, সেহেতু খুব সম্ভব তাকে ভারী যুদ্ধাস্ত্র বয়ে নিয়ে যাবার উপযোগী করেই তৈরী করা হয়েছে। খুব সম্ভব তারা এ-রকম কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্রের অগ্রভাগে যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্তে তৃতীয় আর একটি রকেট বসিয়েছে। এই তিন পর্য্যয়ী রকেট প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জন করে তৃতীয়টির সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে যথাযথ কক্ষপথে স্থাপন করেছে।

তারা কি ধরণের রকেট ব্যবহার করেছে, এখন পর্যন্ত আমরা তা জানি না বটে, কিন্তু প্রথম উপগ্রহ সম্বন্ধে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের সরকারী তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ৫৮ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ ২২·৮৪ ইঞ্চি (ইংরেজেরা বাদে অন্য সব ইউরোপীয়ানদের মত রাশিয়ানরাও মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে) ব্যাসের একটি গোলাকার বস্তু। এর ওজন হচ্ছে ৮৩·৬ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ ১৮৪·৩০ পাউণ্ড। এর উপবৃত্তকার কক্ষপথের পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান হলো ২৫০ কিলোমিটার (১৫৫·৩৪ মাইল) ঊর্ধ্বে এবং পৃথিবী থেকে এর সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান হলো ৯০০ কিলোমিটার (৫৫৯·২৩ মাইল) উপরে। প্রথম চেষ্টায় যতটা সাফল্য লাভের আশা করা যায়, রাশিয়ানরা তার চেয়ে অনেক সন্তোষজনক-ভাবে উপগ্রহটিকে অভিপ্রেত কক্ষপথে স্থাপন করেতে সক্ষম হয়েছে।

এই অপূর্ব কার্যনৈপুণ্যের পিছনে প্রায় ত্রিশ বছরের এক পটভূমিকা রয়েছে এবং তা হচ্ছে নানাবিষয় সংশ্লিষ্ট কাহিনী—যা যা আমরা পরে দেখতে পাব।

মহাকাশ যুগের প্রবক্তা

প্রথম যখন স্পুটনিকের বিপ্‌ বিপ্‌ শব্দ শোনা গেল তখন অনেকের মনেই যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, একজন রেডিও ভাষ্যকার তা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিস্ময়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন—বিজ্ঞানের উপকথা আজ বাস্তবে পরিণত হলো। নিজে তিনি যা জানতেন, তার চেয়ে অনেক বেশী খাঁটি কথাই বলেছিলেন। কারণ, কৃত্রিম উপগ্রহের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল একটি বিজ্ঞানের গল্পে। সে অনেক কাল আগের কথা—১৮৭০ সালে "অ্যাটলাণ্টিক মান্থলি" নামে একখানা মাসিক পত্রের পাতা খুলেই পাঠকেরা দেখতে পেলেন—'The Brick Moon' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতব্য একখানি উপন্যাসের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের লেখক ছিলেন এডওয়ার্ড এভারেট হেল (ন্যাথান হেলের ভ্রাতুষ্পৌত্র) নামে একজন ধর্মযাজক ; গল্পে বলা হয়েছিল যে, একদল লোক পৃথিবীর জন্যে আর একটি চন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে। নাবিকদের পক্ষে এই কৃত্রিম চন্দ্র হবে খুবই মূল্যবান। তারা ইট দিয়ে কুঠুরীযুক্ত ২০০ ফুট ব্যাসের গোলাকার একটা কাঠামো তৈরী করে এবং স্থির হয় যে, কোন একটা তারিখে সেটা ঊর্ধ্বে প্রেরিত হবে। যেহেতু এটা একটা গল্প সেহেতু সেটা যখন আকস্মিকভাবে উপরে উঠে গেল তখনও কিন্তু নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত সাঁইত্রিশ জন কর্মী তার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।

গল্পের অবশিষ্ট অংশের এখানে আর প্রয়োজন নেই। যেটুকুর প্রয়োজন, সেটুকু হচ্ছে—ধর্মযাজক হেল যা ধারণা করেছিলেন সেটা ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল। খুব বড় এবং সহজে দৃষ্টিগোচর হতে

পারে, এরূপ একটা কৃত্রিম উপগ্রহ হবে সমুদ্রবক্ষে জাহাজ চালনার পক্ষে খুবই মূল্যবান এবং বিজ্ঞানীরা এরকম কৃত্রিম উপগ্রহের কথা আজ গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তাঁরা অবশ্য ইটের গাঁথুনি দিয়ে এরূপ উপগ্রহ তৈরী করবেন না এবং সেটা আকস্মিকভাবে উপরেও উঠে যাবে না ; তবে ধারণাটা কিন্তু নির্ভুল। হেলের পূর্বে— বিজ্ঞান বিষয়ক কাহিনী নিয়ে প্রায় আধ ডজনের মত উপন্যাস রচিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল চন্দ্রলোক যাত্রা সম্বন্ধে। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের কথা হেলের মনেই প্রথম উদিত হয়েছিল। হেলের পর খুব শীঘ্রই কৃত্রিম উপগ্রহের ধারণা উপকথার জগৎ থেকে প্রথমে বিচার বুদ্ধি সাপেক্ষভাবে বিজ্ঞানের আওতায় প্রবেশ করে।

প্রায় একই সময়ে জার্মানীতে হারম্যান গ্যান্স্উইণ্ড নামে বিচিত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উদ্ভাবক যদিও তার বেশীর ভাগই ছিল কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ। ১৮৮৩ সালে যখন তিনি এক রকম উড়োজাহাজের পেটেন্ট গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। এটা এখন আমাদের কাছে সেকেলে মনে হয় বটে, কিন্তু তৈরী করা হলে সেটা কার্যোপযোগী হতে পারতো। এর মাত্র কয়েক বছর পরেই তিনি চাপ-নিরোধক কেবিন সমন্বিত, রকেটের সাহায্যে চালিত মহাকাশ-যানের কথা বলতে সুরু করেন। এটা তৈরী করা হলেও কার্যোপযোগী হতো না। কারণ তাতে কত জ্বালানী খরচ হবে, তা হিসাব করে দেখবার মত অঙ্কশাস্ত্রের বিদ্যা গ্যান্স্উইণ্ডের ছিল না এবং তিনি অবিশ্বাস্য রকমের কম হিসেব করেছিলেন। তারপর ১৯০২ সালে তিনি একটা হেলিকপ্টার তৈরী করেন। যথেষ্ট শক্তিশালী একটা ইঞ্জিন পেলে সেই হেলিকপ্টারটাকে আকাশে ওড়াতে পারতেন। (কিন্তু ওড়াবার সময় সেটা স্থিরভাবে থাকতো না।)

মহাকাশ-যান সম্বন্ধে রাশিয়ায় গ্যান্‌স্‌উইণ্ডের অজ্ঞাত এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কনষ্টাণ্টিন এডোয়ার্ডোভিচ জিয়োল্‌কভস্কি নামে একজন স্কুলমাষ্টার। ১৮৫৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্যান্‌স্‌উইণ্ডের মত অবসর সময়ে তিনি উদ্ভাবনের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। তিনিও বেলুন-বাহিত আকাশ-যানের কথা ভেবেছিলেন এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথমে যাঁরা বায়ু-সুড়ঙ্গের কথা চিন্তা করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন, যদিও সর্বপ্রথম নন। এমন কি, তিনি একটি বায়ু-সুড়ঙ্গ তৈরীও করেছিলেন; কিন্তু এর সাহায্যে কিরূপে ভালরকমে কাজ করা যায়, সে সময়ে এ-বিষয়ে কারো যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না। ১৮৯০ সালের পর কোন এক সময়ে জিওলকোভস্কি মহাশূন্যে রকেট পরিচালনের বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলেন। বধিরতা এবং দারিদ্রের জন্যে তার মনে শান্তি না থাকলেও রকেট পরিচালন সম্বন্ধে সবকিছু প্রয়োজনীয় বিষয়—যেমন, তরল বা অন্য কোন রকমের জ্বালানী ব্যবহৃত হবে—ইত্যাদি আলোচনা করে একটি নিবন্ধ তৈরী করেন। নিবন্ধটির নাম দিয়েছিলেন—'প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সহায়তায় গ্রহান্তরের আকাশ অভিযান' এবং 'সায়েণ্টিফিক রিভিউর' সম্পাদকের নিকট সেটি ডাকযোগে প্রেরণ করেন।

সম্পাদক এই পাণ্ডুলিপি পেয়ে নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। তবে কি এই অপরিচিত স্কুল মাষ্টার তাঁর সঙ্গে তামাসা করেছেন? কিন্তু অন্যদিকে আবার বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখলেন—তাতে পরিষ্কার কোন ত্রুটি পাওয়া গেল না। যেখানে যুক্তি ক্ষীণ সেখানেই মানুষ একথা বলে। সম্পাদক নিশ্চয়ই বিভিন্ন লোককে সেই পাণ্ডুলিপি দেখতে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা যে ঠিক এরূপই ঘটেছিল, তা বলা যায় না; কারণ এসব খবরের মূল উৎস আমাদের জানা

নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদককে কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি অন্ততঃ পাঁচ বছর চেপে রাখতে হয়েছিল। অবশেষে ১৯০৩ সালে তিনি মনস্থির করেন এবং পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করেন।

একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে যেটুকু স্বীকৃতি পাওয়া গেল তাতেই বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে জিওলকোভস্কি কাজে লেগে গেলেন এবং লিখতে সুরু করেন। বহুকাল পূর্বে লুপ্ত আকাশ উড্ডয়ন সম্পর্কিত একখানি রাশিয়ান সাময়িক পত্রিকায় ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে মহাশূন্য পরিভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপরে আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং জিওলকোভস্কি তাঁর সমস্ত সময় শিক্ষকতার কার্যে নিয়োগ করেন।

কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবের সময় সরকারী সোভিয়েট প্রকাশকের কাছ থেকে হঠাৎ বেশ একটা মোটা টাকা পেয়ে তিনি খুবই বিস্মিত হয়ে যান। ব্যাপার কি হলো?

বিশ বছর পূর্বে অবসর সময়ে জিওলকভ্স্কি 'পৃথিবী থেকে দূরে' নামে একখানি বৈজ্ঞানিক উপন্যাস লিখেছিলেন। পরে তিনি আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন যে, ১৮৯৬ সালে তিনি বইটি লিখতে সুরু করেন; কিন্তু নানান কাজ, বিভিন্ন সমস্যা এবং পারিবারিক ঘটনায় এতে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়। ১৯২০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন এক কমিশার সেটিকে তখনও একটি চমৎকার পঠনীয় পুস্তক হিসাবে গণ্য করে প্রকাশনী তালিকাভুক্ত করেন। জিওলকভ্স্কিকে এজন্যেই টাকাটা দেওয়া হয়েছিল।

বিশেষ করেই একথা বলা দরকার যে, এটা কোন 'বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি' নয় এবং আজ পর্যন্তও সে স্বীকৃতি মেলে নি। জিওলকভ্স্কিকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় নি, লেখক হিসেবে তাঁর নাম

পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল মাত্র। ১৯২৩ সালে জার্মোনীতে হারম্যান ওবার্থ নামে একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র কর্তৃক লিখিত মহাকাশ পরিভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। কোন এক ব্যক্তি 'প্রাভদায়' এই বইখানার সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা পাঠ করে অপর একব্যক্তির মনে হয়— পূর্বে কোথাও যেন তিনি এই রকমের কিছু একটা পড়েছিলেন। ১৯০৩ সালের 'সায়েন্টিফিক রিভিউ'তে প্রকাশিত জিওলকভ্স্কির সেই পুরাতন নিবন্ধগুলি পুস্তিকার আকারে তখনই পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। পুস্তিকা-খানি অবশ্য মহাশূন্যে রকেট (A Rocket into Cosmic Space)—এই নতুন নামে প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, বইখানিতে জার্মান ভাষায় এ. এল. চিয়েভ্স্কি নামক এক ব্যক্তির ভূমিকা লিখিত ছিল। তাতে তিনি লিখেছিলেন—"যা প্রথমে আমাদের সীমাহীন বাসভূমিতে উৎপন্ন হয়েছিল এবং অবহেলার ফলে নিরালায় শুকিয়ে গেছে, তা কি চিরকালই আমাদের বিদেশীয়দের কাছ থেকে নিতে হবে?"

জিওলকভ্স্কি এবং গ্যান্স্উইণ্ড উভয়েই ৭৮ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। গ্যান্স্উইণ্ড ১৯৩৪ এবং জিওলকভ্স্কি ১৯৩৫ সালে পরলোকগমন করেন। তখনও আমি জিওলকভ্স্কির সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতাম, তাঁর স্বাক্ষরিত অনেক বই-ই তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এবং অনেক সন্ধ্যাই আমি গ্যান্স্উইণ্ডের সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি যাতে তাঁর জীবনী লিখতে পারি, সেজন্য তিনি জীবনের ঘটনা আমাকে বলেছেন। কিন্তু গ্যান্স্উইণ্ডের মৃত্যুর পর কেউ তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি।

রকেট-বিজ্ঞান ও মহাশূন্য-যান

পরিচালন বিভার জনক

১৮৮২ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর উর-সেষ্টারের সহর-করনিক নতুন কয়েকটি জন্মের খবর রেজিষ্ট্রার খাতায় লিখে রেখেছিলেন। তারমধ্যে একটি ছিল—গডার্ড, রবার্ট হাচিন্‌স্—জন্ম ৫ই অক্টোবর, ন্যাহাম ড্যানফোর্ড ও ফ্যানি লুইস গডার্ড, এর পুত্র।

যাঁরা জন্ম রেজেস্ট্রী করেন, তাঁদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয় যে, পরবর্তীকালে এই নাম তার নিকট আত্মীয়স্বজনের মধ্যে স্মরণীয় হবে, না—বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকাভুক্ত হবে, অথবা এই নামে স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হবে। রবার্ট এইচ. গডার্ডের আজও কোন প্রকাশ্য স্মৃতিস্তম্ভে ক্ষোদিত হয় নি বটে, কিন্তু একদিন ক্ষোদিত হবে। ইতিমধ্যেই রকেট-ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে তাঁর নাম 'রকেট বিজ্ঞানের জনক' এই আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। ১৯০৮ সালে যুবক রবার্ট বি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং তখনও তিনি রকেটের বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। রকেট যে সংশয়াতীত শক্তির অধিকারী, সে কথা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে রকেট-পরিচালন সম্পর্কে কেউ কখনও পদার্থতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেন নি। রকেট সম্পর্কিত—প্রয়োজনীয় গণিতবিদ্যা উন্নয়নের চেষ্টায়ও কেউ অগ্রসর হন নি—তিনি যা করতে চাইছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়—গডার্ড যে ভেবেছিলেন, এসম্বন্ধে কেউ কিছু করেন নি—সে কথা ভুল। ১৮২৫ সালে (!) মণ্টগেরি নামে

ফ্রান্সের অধিবাসী এক ভদ্রলোক এবং ১৯০৬ সালে রিয়াবুসিনস্কি নামে একজন রাশিয়ান এরূপ চেষ্টা করেছিলেন। জিওলকভ্স্কিও অবশ্য বাদ যান নি। বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট তরুণ ছাত্রটির এসব প্রকাশিত তথ্যাদির কথা জানা ছিল না। ১৯১৪ সালের মধ্যেই গডার্ড একরকম পর্যায়ক্রমিক রকেট (যে রকেটে একটির সাহায্যে অপরটি পরিবাহিত—হবার ব্যবস্থা থাকে) তৈরীর পরিকল্পনা করেন এবং তার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে আরও কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করেন। তারপরে তিনি উন্নতধরণের একপ্রকার রকেটের পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি নৌ-বিভাগের চাকুরী পান এবং তাঁকে নৌ-বিভাগের সঙ্কেতবাহী রকেটের উন্নতি বিধানের ভার অর্পণ করা হয়। এসব কাজে ব্যাপৃত থাকবার সময় তিনি রকেটতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এ-সম্বন্ধে কয়েকটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন (এসব স্মারকলিপি পঠিত হয়েছিল কিনা, অথবা পঠিত হয়ে থাকলে এ-বিষয়ে তাঁরা কি ভেবেছিলেন—সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি)। প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর গডার্ড তাঁর সব যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা একত্রিত করে "সর্বাধিক উচ্চতায় পৌঁছোবার উপায়" সম্পর্কে নিছক একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেন।

১৯১৯ সালে স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউসনে এই নিবন্ধটি মুদ্রিত হয়ে ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের পক্ষে এটা ছিল সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য—কেবল রাশি, সমীকরণ, ছক প্রভৃতিতে ভর্তি। এতে পড়বার মত জিনিষ কিছু ছিল না বললেই চলে। কেবল একটি বিষয় বাদে—সেটি হলো—অধ্যাপক (ইতিমধ্যে গডার্ড অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন) বলেছেন যে, চাঁদে রকেট প্রেরণ সম্ভব। রকেট সেখানে পৌঁছবার পর পরিবাহিত বারুদস্তূপে

বিস্ফোরণ ঘটবে এবং বিস্ফোরণের দরুণ আলোর ঝলক রকেটের চাঁদে উপস্থিতির সঙ্কেত জ্ঞাপন করবে। কোন কোন সমালোচক এটাকে সম্পূর্ণ একটা বাজে ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিলেন ; কারণ তাদের ধারণা ছিল—শূন্যস্থানের মধ্যে রকেট পরিচালিত হতেই পারে না। (এখন আমরা জানি, বায়ুশূন্য স্থানের মধ্যে রকেট পরিচালিত হতে পারে এবং হচ্ছেও) এবং কেউ কেউ ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষী বলেই ধরে নিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে দাবিয়ে দেবার মত ব্যক্তিত্ব গডার্ডের ছিল না, কাজেই এসব নানারকম বিদ্রূপ মন্তব্যে ক্রমশঃই তিনি নিস্পৃহ হয়ে ওঠলেন, কিন্তু গাগেনহাইম ও কার্নেগী ফাউণ্ডেসনের বৃত্তিলব্ধ অর্থ সাহায্যে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং ১৯৩৫ সালে তাঁর তৈরী রকেটের মধ্যে একটি ৭৫০০ ফুট উর্ধ্বে আরোহণ করতে সক্ষম হলো।

অর্থের অভাবে তারপর তাঁর কাজ বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবার পর পুনরায় তিনি নৌ-বিভাগের কাজে যোগদান করেন। এবার নৌ-বিভাগের "ওড়ান-তরীকে" জল থেকে প্রথমে উপরে তুলে দেবার সুবিধা করবার জন্যে রকেট তৈরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বার গলায় অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর যদি মাত্র দুটি বছর তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলেই স্বচক্ষে দেখে যেতে পারতেন—রকেট কি অসাধ্য সাধন করতে পরে ! রকেটকে প্রথমে উৎক্ষেপণে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন তা প্রত্যক্ষ গৌরবার্জনে সক্ষম হয় নি ; কারণ ক্যালিফোর্নিয়ার একদল কর্মী এই ব্যাপারে অনেক বেশী কৃতকার্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এখন জানেন যে, গডার্ডই ছিলেন এবিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শক।

গ্যান্স্‌উইও এবং জিওলকভ্‌স্কি উভয়ে উভয়ের অস্তিত্ব না জেনেও যে একই কাজে লিপ্ত ছিলেন, গডার্ড এবং তাঁর জার্মান সমকর্মী হারম্যান ওবার্থের নামও সেরূপ একই ভাবে উল্লেখযোগ্য। ওবার্থ (বর্তমানে সেনাবাহিনীর হান্টস্‌ভিলে, রেডষ্টোন অস্ত্রাগারের, (অ্যালাবামা) গণিতজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন) ১৮৯৪ সালের ২৫শে জুন, প্রধানতঃ হাঙ্গেরীয়ান এলাকার জার্মান ভাষাভাষী ট্র্যানসিল-ভেনিয়ার স্থাস্‌বুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, সেহেতু পুত্রেরও চিকিৎসক হওয়ারই কথা, কিন্তু অস্থি-মজ্জাদির কথা বাদ দিলেও রক্তনালী, মাংসপেশী এবং আভ্যন্ত-রীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অপেক্ষা গণিত-চর্চাতেই তিনি অধিকতর উৎসাহ বোধ করতেন।

গডার্ডের চেয়ে যদিও বারো বছরের ছোট ছিলেন, তথাপি প্রথম মহাযুদ্ধ চলবার কালে একই সময়ে তিনি তাঁর মৌলিক যুক্তি খাড়া করেন। জিওলকভ্‌স্কির মত তিনিও তরল জ্বালানী ব্যবহারের কথাই স্থির করেন। তরল জ্বালানীর কথা গডার্ড একবার মাত্র উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় অবশ্য তরল জ্বালানীই ব্যবহার করেছিলেন। গডার্ডের মত ওবার্থও ষ্টেপ-রকেট, অর্থাৎ পর্যায় ক্রমিক রকেটের বিষয় চিন্তা করেছিলেন। কেবল এই দুটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ অমিল ছিল। গডার্ড তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন—"A Method of Reaching Extreme Altitude," আর ওবার্থ তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন "The Rocket into Interplanetary Space"। গডার্ড চিন্তা করছিলেন, বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের অবস্থা জানবার জন্যে যন্ত্রবাহী, রকেটের কথা। ওবার্থও একরকম যন্ত্রবাহী রকেটের বর্ণনা দিয়ে ছিলেন, কারণ বৈজ্ঞানিক কাজের জন্যে সেটার খুবই প্রয়োজনীয়তা

ছিল। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল—ভবিষ্যতে যে মহাকাশ-যান তৈরী হবে, এই যন্ত্রবাহী রকেটটি হবে তারই একটি অনুকৃতি মাত্র। রকেটের যে কোন কিছু একটু উন্নতি সাধিত হোক না কেন, ওবার্থ (এবং তাঁর শিষ্যবর্গও বটে) তাকেই মহাকাশ-যাত্রার পথে অগ্রগতি বলে মনে করতেন। তখন ক্ষেপণাস্ত্রের কোন ধারণাও কারোর ছিল না। তরল জ্বালানী-চালিত রকেটগুলি খুব বড় হলেই, সেগুলিকে মহাকাশ-যান হিসেবে ধরা হতো। কাজেই কার্য-তালিকায় তখন একটি সমস্যা ছিল—যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সেগুলিকে বড় করে তোলা।

১৯২৩ সালে ওবার্থ লিখলেন—বৃহদাকৃতির একটা রকেটকে পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব। যাত্রীরা তখন ছোট্ট রকেটের সাহায্যে অবতরণ করে আবার অতিরিক্ত যন্ত্রাদির ব্যবস্থায় পূর্বপথেই সেখানে ফিরে যেতে পারবে। এরূপেই প্রদক্ষিণকারী রকেট এক সময়ে যাত্রীবাহী আকাশ-স্টেশনে পরিণত হবে। ই. ই. হেলের "ব্রিক মুন" ইষ্টক-নির্মিত চন্দ্রের পর এই-ই সর্বপ্রথম যাত্রীবাহী কৃত্রিম উপগ্রহের কথা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। ওবার্থ অবশ্য সে গল্প পড়েননি। কারণ তিনি অতি কষ্টে ইংরেজী ভাষা পড়তে পারতেন। আমি কখনও তাঁকে কোন ভাষায় উপন্যাস পড়তে দেখিনি।

'ডিম' এবং ভবিষ্যৎ

বিস্তৃতভাবে রকেট-গবেষণার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে ১৯২০ সালে ওয়াশিংটনে অধ্যাপক রবার্ট এইচ. গডার্ডের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তত্ত্বগতভাবে মহাশূন্য-ভ্রমণের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করে অধ্যাপক হারম্যান ওবার্থের বইখানিও ১৯২৩ সালে মিউনিকে

আত্মপ্রকাশ করে। পুস্তক দুখানি পাঠকদের মনে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

অধ্যাপক গডার্ডের বইখানিকে একদিকে যেমন বেশী বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয় নি, অন্যদিকে তেমন আবার এর দ্বারা অতি সামান্যই আর্থিক আনুকূল্য হয়েছিল। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক সমালোচনা বা বাদানুবাদ হয়নি। অধ্যাপক ওবার্থের বইখানি সম্পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। পেশাদর কাগজে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হলো, কিন্তু কোন রকম আর্থিক আনুকল্য হলো না। এটাই সব জিনিষটাকে আন্তর্জাতিক পথে নিয়ে যায়। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাশিয়ানরা তাদের মহাকাশ পরিভ্রমণ প্রবক্তা জিওলক-ভ্স্কিকে পুনরাবিষ্কার করেছিল। তাছাড়া ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের অবস্থা অনুসন্ধান কল্পে একটি কমিটি গঠন করে এবং ১৯২৫ সালে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের অবস্থা অনুসন্ধানে রকেটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই কমিটি কর্তৃক দু-খণ্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মহাশূন্য পরি-ভ্রমণের অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে, এরূপ কোন সর্বোৎকৃষ্ট নিবন্ধ বা গবেষণা-কার্যের জন্যে ফরাসী দেশের রবার্ট এস্নল্ট-পেলটরি নামে একজন বৈমানিক (৪নং পাইলট লাইসেন্স গ্রাহক) অ্যাণ্ড্রি হার্স নামে প্যারিসের একজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে একযোগে একটি বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে আমেরিকায় অধ্যাপক গডার্ড তরল জ্বালানী-চালিত তাঁর প্রথম রকেট ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণে সক্ষম হন (১৯২৬); কিন্তু তিনি এ-খবর জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেননি—সম্ভবতঃ তিনি মনে করেছিলেন যে, মাত্র ১৮৪ ফুট উচ্চতা তেমন কিছু একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়।

জার্মানীতে কিছু সংখ্যক লোক, যাঁরা এ-সম্বন্ধে অধ্যাপক

ওবার্থের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করছিলেন, সিদ্ধান্ত করলেন যে, এর দ্বিতীয় পর্যায় হবে—পরীক্ষার কাজ চালানো। এর অর্থ হলো টাকা—তাঁরা চিন্তা করে দেখলেন—পরীক্ষাকার্য চালাবার জন্যে টাকা তোলবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে—একটি সোসাইটি স্থাপন করা। ১৯২৭ সালে "Society for Space Travel, Inc." রেজিস্ট্রি করা হলো। প্রাথমিক কিছু কাজ সমাধা হওয়ার পর অধ্যাপক ওবার্থ এর প্রেসিডেন্ট হন এবং আমি হই এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। কয়েক বছর পরে জি. এড্ওয়ার্ড পেণ্ড্রে ও ডেভিড ল্যাসার নিউইয়র্কে "আমেরিকান ইন্টারপ্ল্যানেটারী সোসাইটি" গঠন করেন। পরে এই নামের পরিবর্তে "আমেরিকান রকেট সোসাইটি" নাম রাখা হয়। এটা এখন পেশাদার রকেট-কর্মীদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। এর সভ্য সংখ্যা এখন আট হাজারেরও উপর। এর বছর খানেক বা বছর দুই পরে বৃটিশ ইন্টারপ্ল্যানেটারী সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং এটা এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান (জর্জ বার্ণার্ড শ এর একজন সদস্য ছিলেন)।

মহাশূন্য পরিভ্রমণের জন্য জার্মান সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—পরীক্ষা-কার্য পরিচালন করা এবং কোথা থেকে সুরু করতে হবে, সেটাও তারা জানতেন। রকেট মোটর তৈরী করাই ছিল প্রথম কাজ। ওবার্থ কর্তৃক পরিকল্পিত তরল-জ্বালানীর রকেটে গ্যাসোলিনের সঙ্গে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হতো। এটা করবার জন্যে এই তরল পদার্থকেই পৃথকভাবে জ্বালানী-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানো মাত্র ঠিক মিশ্রিত হবার সময়ে অগ্নি সংযোগ করতে হতো।

এ-রকমের কাজ পূর্বে কখনও করা হয়নি; কাজেই কতকগুলি ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলো। ভাল্ভগুলি জমাট বেঁধে বন্ধ হয়ে গেল এবং প্রয়োজনের সময় খুললো (বা বন্ধ হলো) না। একটা

হাত-বোমার বিস্ফোরণের শব্দে রকেটের মোটর উড়ে গেল। একবার কিছুক্ষণের জন্যে সেগুলি বেশ কাজ করেছিল। পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে—এগুলি ছিল কাজেরই প্রশ্ন। যদি আমরা প্রায়ই এ-কাজ করতাম, তবে শিখতে পারতাম, কেমন করে কাজটাকে ঠিক মত করতে হয়। একটা বড় সমস্যা ছিল এই যে, অনেক সময় পুড়িয়ে রাস্তা করে অগ্নিশিখা রকেট-মোটরের বাইরে বেরিয়ে আসতো। ঠাণ্ডা জল ভর্ত্তি আবরণী এতে খুব সাহায্য করেছিল। পরিশেষে আমরা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী বেশ ভাল একটি নির্ভরযোগ্য মোটর পেয়েছিলাম। আমরা এটাকে কি বলি—দর্শকেরা একথা জিজ্ঞেস করলে—তাদের নিরাশ করতে হতো। এটাই ছিল সেই মোটর, পিরিয়ড। গোপনে আমরা বলতাম—"ডিম"। ঐ রকমই ছিল তার আকৃতি—অনেকটা রাজহাঁসের ডিমের মত।

"ডিমের" প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সাধারণতঃ ৩০ সেকেণ্ডে চলবার পরেই সেগুলি পুড়ে যেত। কিন্তু রকেটের প্রায় আধ মাইলের মত উপরে উঠতে ৩০ সেকেণ্ড সময়ই যথেষ্ট। সর্বাধিক উচ্চতায় ওঠবার পর যখন একটা ছোট্ট সাদা প্যারাসুট লাফিয়ে বেরিয়ে এসে রকেটটাকে আবার নীচে নামিয়ে আনে—দর্শকেরা তখন সেদৃশ্য দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে যান।

স্বভাবতঃই যন্ত্রবিজ্ঞানসম্পর্কিত অসংখ্য আলোচনা হয়। যদি ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তবে কি 'ডিমটা' আরও বেশী সময় স্থায়ী হবে? প্রথমে ঠাণ্ডা জল সঞ্চালনের পর আবরণীর ভিতর আবার ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করানো সম্ভব হবে কি? আচ্ছা ঠাণ্ডা আবরণীর ভিতর দিয়ে দাহ্য পদার্থ সঞ্চালিত করে দেখা যাক না কেন? আমাদের প্রধান পরীক্ষাকারী ক্লাউস রিয়েডেল গ্যাসোলিনের সাহায্যে এ-রকমের পরীক্ষা করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই

একটি মোটর উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তত্ত্বগত কারণে আমি জ্বালানী হিসেবে ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করে পুনরায় এই পরীক্ষাটা চালাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং জল-সংযোগে জ্বালানীর আয়তন বাড়িয়ে নিতে বলেছিলাম। এবার সেটা খুব চমৎকার রকম কাজ করলো। প্রথমে ঠাণ্ডা আবরণীর ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত হবার পর ইথাইল অ্যালকোহলের দ্বারা চালিত 'ডিম', পরবর্তী বৃহৎ রকেট-মোটরগুলির অগ্রদূতরূপে পরিগণিত হয়েছিল। জার্মান ভি-টু রকেট এবং তার পরবর্তী আমেরিকার ভাইকিং রকেট এবং রকেটচালিত এক্স-১ এবং এক্স-১এ প্রভৃতি গবেষণাকার্যের বিমান প্রভৃতিতে এই পদ্ধতি এবং একই রকম মিশ্রণের দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হতো।

তখন যে সব রকেট সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল আষ্ট্রিয়াতে। এর সেক্রেটারী, ইঞ্জিনিয়ার গুইডো, ব্যারন ভন পিরকেট রকেট উন্নয়নের এক দার্শনিক মতবাদ (যার একান্ত অভাব ছিল)—প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি বললেন—রকেট প্রথমে হবে সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক। প্রথম কার্যকরী পন্থা হবে যন্ত্রাদি পরিবাহক রকেট, গডার্ড যে রকমের রকেটের কথা ভেবেছিলেন। এগুলিকে ক্রমশঃ বড় করে গড়ে তুলতে হবে এবং যন্ত্র-পরিবাহক সব চেয়ে বড় রকেটটিকে অতি দ্রুতগতিতে ডাক চলাচলের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারবে। ডাক চলাচলের এই রকেটগুলিকেও ক্রমশঃ এমন বড় করে তুলতে হবে—যাতে সেগুলি এক একজন চালক নিয়ে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারে। এগুলিই হবে প্রথম মহাকাশ-যান; কিন্তু এর আগে তাদের প্রথম কাজ হবে—আকাশ-ষ্টেশন, অর্থাৎ মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা।

লক্ষ্য করে থাকবেন—ব্যারণ ভন পিরকেটের কার্য-তালিকায় (১৯২৯) তখনও কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বলা হয়নি।

ক্ষেপণাস্ত্রের আগমন

১৯২৯-৩০ সালের শীতের এক অপরাহ্নে বার্লিনে আমার ঘরে ঢুকেই শুনলাম, কেউ একজন পিয়ানো বাজাচ্ছে। পরিবারের অপর একটিমাত্র লোক, যিনি পিয়ানো বাজাতে পারতেন—তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন না, সে কথা আমি জানতাম; কাজেই পিয়ানো বাদক নিশ্চয়ই কোন আগন্তুক হবেন! ঠিকই তাই, এবং এখনও আমার স্মরণ আছে—তিনি কি বাজাচ্ছিলেন—সেটা ছিল বিটোফেনের 'Moonlight Sonata'-এর প্রথম তরঙ্গ। আগন্তুক প্রায় আঠারো বছরের এক যুবক, যিনি ওয়ার্ণার ভন ব্রাউন বলে নিজের পরিচয় দেন এবং মহাশূন্য পরিভ্রমণ সমিতিতে যোগদান করতে পারবেন কিনা—জানতে চান। আমার একথা না বললেও চলে যে, তিনিই আমাদের মধ্যে সর্বাধিক উৎসাহী পরীক্ষাকারী হয়ে ওঠেন—এখন তিনি হান্টস্‌ভিলে (অ্যালাবামা) মার্কিন সেনাবাহিনীর "ব্যালিষ্টিক মিজাইল এজেন্সীর" (ABMA) অধিনায়ক।

কিন্তু এখানে তিনি অবস্থিত হয়েছিলেন বক্রপথে। ভার্সাই সন্ধি-চুক্তিতে জার্মান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ১,০০,০০০ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছিল। বিমানবাহিনী, বিমান-বিধ্বংসী যে কোন রকমের কামান, তিন ইঞ্চির চেয়ে বড় ক্যালিবারের ফিল্ড আর্টিলারী প্রভৃতি সব কিছুই নিষিদ্ধ হয়েছিল। যাঁরা সারাজীবন বড় বড় এবং তার চেয়ে আরও বড় কামান উন্নয়নে কাটিয়েছেন, তাঁরা এতে (নিষিদ্ধ-করণে) ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠলেন। জার্মান সেনাবাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র অফিসের অধ্যক্ষ, "Handbook of Ballistics" নামক সহজ-অনুধাবনযোগ্য চমৎকার পুস্তকখানির লেখক অধ্যাপক কার্ল বেকার

একটা উপায় খুঁজে বের করেন। সে সময়ে রকেট সম্পর্কে যা কিছু লেখা বেরিয়েছিল, তিনি তার অনেকগুলিই পড়েছিলেন। ব্যারন ভন পিরকেট যে ডাক-বহনোযোগী মেল রকেটের কথা বলেছিলেন, সেরূপ রকেট যদি তৈরী করা যায়, তবে সেটা ডাকের পরিবর্তে যুদ্ধাস্ত্র বয়ে নিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা করলে তাতে সন্ধি-চুক্তিও ভঙ্গ হবে না; কারণ ভার্সাই চুক্তিতে রকেট সম্পর্কে কোন কথারই উল্লেখ নেই। এ কাজ করতে হলে এ-সম্বন্ধে তথ্যাদি নির্ণয়ের জন্যে কিছু গবেষণার কাজ চালানো দরকার।

অধ্যাপক বেকার সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে এরকম লোকের খোঁজ করতে লাগলেন এবং ওয়াল্টার ডনবার্জার নামে একজন ক্যাপ্টেনকে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন।

তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং ভারী কামান সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। ক্যাপ্টেন (পরে জেনারেল) ওয়াল্টার ডর্নবার্জারকে রকেট উন্নয়নের ভার দেওয়া হলো। (নিউ ইয়র্কের বাফেলোতে বেল এয়ারক্র্যাফ্‌টের ক্ষেপণাস্ত্র বিভাগের অধিকর্তারূপে এখনও তিনি ঠিক সেই কাজেই ব্যাপৃত আছেন।) ডর্নবার্জার এমন একজন লোক খুঁজছিলেন, যার তখনকার রকেট সম্পর্কে সামান্য অভিজ্ঞতাও আছে। মহাকাশ-পরিভ্রমণ সমিতির প্রুভিং গ্রাউণ্ড পরিদর্শনে গিয়ে তিনি ওয়ার্নার ভন ব্রাউনের খোঁজ পান। জার্মান সেনাবিভাগ সোসাইটির কাছ থেকে তাঁকে ধারস্বরূপ নিয়ে আসে, কারণ সেনাবিভাগ তাঁকে বেতন দিতে পারতো, কিন্তু আমরা পারতাম না।

ডর্নবার্জার এবং ভন ব্রাউনের এই দল সহকারীদের (যাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছিল) নিয়ে কুমারস্‌ডর্ফ-ওয়েষ্ট নামে বার্লিনের নিকটবর্তী একটা গোলাগুলী পরীক্ষার ক্ষেত্রে কাজ সুরু

করে দেন। তাঁদের প্রথম রকেট-মোটরটি উড়ে যায়। দ্বিতীয়টি কাজ করলো বটে—কিন্তু আজকালকার মান অনুযায়ী মোটেই ভাল বলা যায় না—তবুও সেটা কাজ করেছিল। এই সময়ের মধ্যে জার্মানীতে একটা ওলট পালটের মধ্য দিয়ে হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সেনাবাহিনীর যুদ্ধাস্ত্রবিভাগ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

সেই ইনষ্টিটিউসনের ক্ষুদ্র রকেট দলটি অধিকতর সহায়তা পাবার জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখতো না। ডর্নবার্জার ও ভন ব্রাউন তখন স্থির করলেন যে, তাঁরা যদি কয়েকটা রকেট ছুঁড়তে পারেন তখন হয়তো কারো নজর পড়তে পারে। তাঁরা তখন এ-টু নামক রকেট তৈরী করেন এবং ১৯৩৪ সালের খ্রীষ্টমাস পর্বের অল্প কয়েকদিন পূর্বে উত্তর সমুদ্রের বরকুম দ্বীপ থেকে দুটি এ-টু রকেট উর্ধ্বে প্রেরণ করেন। দুটি রকেটই প্রায় ৬৫০০ ফুট উপরে উঠেছিল।

এই রকেট উৎক্ষেপণের খবর ক্রমে সামরিক বিভাগের উপর-তলায় গিয়ে পৌঁছে এবং ১৯৩৬ সালে জেনারেল ভন ফ্রিশ্ রকেটের পরীক্ষা দেখাবার জন্যে কুমারস্‌ডর্ফ ওয়েষ্টে পদার্পণ করেন এবং সব দেখে খুবই খুসী হয়ে বলেন—আপনাদের কত টাকা দরকার? যথারীতি এই অর্থ সাহায্যের বিষয়টা বিমান বাহিনীর নিকট প্রেরিত হয় এবং বিমান বাহিনীও এতে সম্মতি প্রদান করেন। অর্থ যেন অভূতপূর্ব নদীস্রোতের মত প্রবাহিত হতে লাগলো, যদিও খুব বেশী দিনের জন্যে নয়। যাহোক, প্রথমেই যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় তা বল্টিকসাগরের ইউজডম দ্বীপে নতুন একটি বৃহত্তর গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার পক্ষে যথেষ্ট। মৎস্যজীবি অধ্যুষিত নিকটবর্তী ছোট্ট একটি গ্রামের নাম থেকে এর নাম হয়েছিল—পিনেমুণ্ডি গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

পরে প্রত্যেকেই বলতো—হিটলারের রকেট, অর্থাৎ ভি-টু ওখানেই তৈরী হয়েছিল। প্রকৃত তথ্য হলো—সেটা মোটেই হিটলারের রকেট ছিল না। হিটলার ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত দেরী করেছিলেন—কুমারসডর্ফ-ওয়েষ্টে তিনি পরীক্ষাটি স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষা দেখে হিটলার যাতে সন্তুষ্ট হন, সেজন্যে প্রত্যেকে স্বভাবতঃই যথাসম্ভব চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু হিটলার তেমন খুসী হলেন না—তাঁর দৃঢ় প্রতীতি হলো না। চার বছর অতিক্রান্ত হলো—তবুও তাঁর সে ধারণা পরিবর্তিত হলো না। এটা একটা মুর্খতার কাহিনীর মত শোনাতে পারে বটে, কিন্তু সহজ আক্ষরিক সত্য হলো এই যে, হিটলার তখন এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, দীর্ঘ পাল্লার রকেট ঠিক কাজ করবে না। পরের দিন প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি দূর পাল্লার রকেট কার্যসূচী সম্বন্ধে পূর্বাদেশ সব প্রত্যাহার করেন।

সেনাবাহিনীর লোকজনদের কাছ থেকে নানা কায়দা-কৌশলে কিছু কিছু যেসব অর্থাদি সংগৃহীত হয়েছিল তার সাহায্যেই পরীক্ষাকারীরা কষ্টেসৃষ্টে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ-থ্রি নামে কয়েকটি রকেট ভূমি ছেড়ে উপরে উঠলো, এ-ফাইভ নামে কয়েকটি রকেটও ভাল রকমেই উড্ডয়নে সক্ষম হলো এবং ইতিমধ্যেই এ-ফোর (পরে এর নাম হয় ভি-টু) তৈরী হয়েছিল। প্রথম ভি-টু-গুলি কৌতুক-দৃশ্যের জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় ভি-টু আকাশে ওঠে ১৯৪২ সালের ১৩ই জুন; কিন্তু তার স্থিরতা ছিল না এবং মাইলখানেকেরও কম দূরে সমুদ্রে পতিত হয়। তৃতীয় ভি-টু ১৯৪২ সালের ১৬ই আগষ্ট আকাশে ওঠে এবং ৫ মাইল উর্ধ্বে আরোহণ করে, কিন্তু সেখানেই সামনের অংশটা ভেঙ্গে পড়ে এবং মোটর বন্ধ হয়ে যায়। রকেটটা সমুদ্রে পতিত হয়। চতুর্থ

ভি-টু ১৯৪২ সালের ৩রা অক্টোবর উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ১১৮ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে।

এক বছর পরে, জার্মানীর সামরিক অবস্থা তখন ইতিমধ্যেই খারাপের দিকে গিয়েছিল, তখন ফিল্মে এসব রকেট উৎক্ষেপণের দৃশ্য দেখে হিটলারের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং রকেট কর্মপদ্ধতি চালাবার সম্মতি প্রদান করেন। প্রথম দুটি ভি-টু রকেট কার্যতঃ অর্থাৎ শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়—১৯৪৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে। এদের লক্ষ্যস্থল ছিল প্যারিস। একটা রকেট প্যারিস পর্যন্ত পৌঁছালো না এবং কারোরই নজরে পড়লো না। দ্বিতীয় রকেটটি প্যারিস সহরের উপর গিয়ে পড়লো বটে, কিন্তু সেটাও কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো না—সম্ভতঃ এরোপ্লেন থেকে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে সবাই ভুল করেছিল। ১৯৪৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় লণ্ডনের উপর দুটি ভি-টু রকেট পতিত হয়।

সেদিন থেকেই লোকে বিশ্বাস করতে লাগলো যে, প্রকাণ্ড রকেট তৈরী করা সম্ভব।

যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রকেটের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলি ঘটেছিল। গ্রেট বৃটেন, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌, জার্মানী এবং রাশিয়া প্রত্যেকেই অনিয়ন্ত্রিত রকেট-অস্ত্র তৈরী করেছিল। গ্রেট বৃটেন এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌ উভয়েই স্বাধীনভাবে কার্যারম্ভ করলেও পরবর্তী সময়ে এসব অস্ত্রাদি সম্পর্কে উভয়ে একযোগে কাজ চালায়। জার্মাণ ও রাশিয়ানরা স্বাধীনভাবেই তাদের রকেট উদ্ভাবন করেছিল;

কিন্তু রাশিয়ানরা তাদের নিকট দেনা-পাওনার সর্তে প্রেরিত লক্ষ্য-বস্তু আঘাতকারী অনেক আমেরিকান রকেট ব্যবহার করেছিল। রাশিয়া অথবা গ্রেট বৃটেন—উভয়ের কেউ যেগুলি পরে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রে পরিণত হতে পারতো, এমন বড় রকেট তৈরীর চেষ্টাও করেনি। আমেরিকার অবশ্য প্রাইভেট-এ নামে উর্ধ্বাকাশ যাত্রী রকেট তৈরীর একটি ছোটখাটো পরিকল্পনা ছিল। যুদ্ধের পর সেটিই ডাবলিউ-এ-সি কর্পোরাল নামে অতি উর্ধ্বে আরোহণকারী রকেটে পরিণত হয়। বিমানকে ভূমি থেকে প্রথমে উপরে তুলে দেবার জন্যে, যুদ্ধের বহু পূর্বে বিজ্ঞপিত এক রকম রকেট—ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ এবং জার্মানী উভয়েই স্বাধীনভাবে তৈরী করেছিল এবং এই উভয় দেশই কঠিন এবং তরল জ্বালানীর রকেট নির্মাণে সক্ষম হয়েছিল।

হিটলারের ব্যক্তিগত ঔদাসীন্য সত্ত্বেও বড় বড় ক্ষেপণাস্ত্রের সমারোহ ছিল জার্মানীর দিকেই। এক টন বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে প্রায় ১৫০ মাইল যেতে পারে—জার্মান বিমান-বাহিনী ভি-ওয়ান নামে এরূপ এক রকম উড্ডুক্ বোমা তৈরী করেছিল। জার্মান সেনাবাহিনীই সর্বপ্রথম এ-ফোর বা ভি-টু নামে একটন ওজনের বিস্ফোরক সহ মোটামুটি প্রায় ১৯০ মাইল পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করে। জার্মানরা ৮০৭০ ভি-ওয়ান উড্ডুক্ বোমা, ১৩০০-এরও বেশী ভি-টু রকেট লণ্ডনের প্রতি নিক্ষেপ করে। নরউইচে প্রায় ৪০টি এবং অ্যানটোয়ার্পে সম্ভবতঃ ২০০টি ভি-টু রকেট নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে এ-সম্বন্ধে যে হিসেব রাখা হয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ নয়।

লাল ফৌজ যখন জার্মানীতে প্রবেশ করে তখন পিনেমুয়েণ্ডির গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে গবেষক ও পরিকল্পনাকারী কর্মীরা

ব্যাভেরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই কর্মীরা দলবদ্ধভাবে আমেরিকান বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিছুকাল পরে তাঁদের আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়।

এখনও এই গল্প সর্বত্র প্রচলিত যে, রাশিয়ানরাই ভাল ভাল সব জার্মান ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে গিয়েছিল। কথাটা মোটেই সত্য নয়, মনস্তাত্বিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই অনেকে এরূপ কথা বলে থাকে। অনেকে একথা ভাবতেই ভয় পায় যে, রাশিয়ানদের মধ্যে ভাল ভাল বিজ্ঞানী কর্মী এবং ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ার আছে। কিন্তু যখন রাশিয়ানদের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের বিষয় অস্বীকার করা যায় না তখন সে সব কৃতিত্বের মূলে জার্মান বিজ্ঞানীরাই রয়েছেন—এই ভেবে তারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেন। মোটের উপর, জার্মানীর যে বিজ্ঞানী আছেন—একথা সাধারণতঃই স্বীকৃত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐরকম লোকেরাই পূর্বে একথা বলে বেড়াতো যে, জার্মানীর গবেষকেরা গডার্ডের বই থেকেই রকেট নির্মাণের যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে। এগুলিও অবশ্য বাজে কথা। গডার্ড-তাত্বিক ভিত্তির কথা বলেছেন একথা সত্য, কিন্তু ওবার্থও সে সব কথা বলেছেন। জার্মানদের যা প্রয়োজন ছিল, তা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং-এর খুঁটিনাটি, গডার্ড যার কিছুই প্রকাশ করেননি; প্রকৃত প্রস্তাবে নিজে করেও দেখেননি।

যাহোক, 'রাশিয়ানরা জার্মানীর ভাল ভাল সব রকেট বিজ্ঞানীদের নিয়ে গিয়েছিল,—এই ভ্রান্ত ধরণার মূলে খুব সামান্যই যুক্তি ছিল। প্রথমতঃ, রাশিয়ানরা এক সময়ে ঠিক এ-রকম কথাই বলেছিল। তারা ভি-টু রকেট উৎপাদনকারী জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদেরই আটক করেছিল মাত্র; পরিকল্পনা-কর্মী এবং গবেষক কর্মীরা এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ভ্রান্ত ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল এই কারণে

যে রাশিয়ানরা জার্মান এবং অষ্ট্রিয়ান জেট-ইঞ্জিন বিশেষজ্ঞদেরও আটক করে নিয়েছিল এবং ১৯৪৫ সালেও অধিকাংশ লোকই জেট এবং রকেটকে একই জিনিষ বলে মনে করতো।

এই যদি হয়—তবে রাশিয়ানরা জার্মানদের কাছ থেকে কি পেয়েছিল? জার্মানীতে যতগুলি ভি-টু রকেট ছিল, তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি তারা পেয়েছিল। যাঁরা রকেট নির্মাণের শেষ অবধি যাবতীয় বিষয় অবগত ছিলেন—এমন কিছু সংখ্যক উৎপাদনকারী ইঞ্জিনিয়ারকে তারা আটক করেছিল। বহু টন দলিল-পত্রও তারা দখল করেছিল। অধিকন্তু ভি-টু সম্পর্কে যে কোন রকমেই হোক, প্রকাশিত তথ্যাদি এবং কিছু মডেলও তারা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল।

পূর্ব ফ্রন্টে জার্মানরা কখনও ভি-টু রকেট ব্যবহার করেনি। কিন্তু জার্মান সৈন্যদের শিক্ষা-শিবির ছিল পোল্যাণ্ডে এবং কতকটা হয়তো সৈন্যদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, কতকটা হয়তো শেষের দিকে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা অপসরণের জন্যে কয়েকটা ভি-টু ব্যবহার করা হয়েছিল। একবার এই শিক্ষা-শিবির অধিকতর নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেই সময়ে প্রত্যেকটি জিনিষই যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে জার্মানরা নিশ্চিত। লাল ফৌজ যখন খুব কাছে এসে পড়েছিল তখন দ্বিতীয় বার শিবির গুটাবার প্রয়োজন হয় এবং সেটাও করতে হয় খুবই তাড়াতাড়ি। এই তাড়াহুড়ার সময় হয়তো দু-চারটা রকেট পিছনে ফেলে গিয়েও থাকতে পারে!

অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক কিছু মূল্যবান সম্পদ আহরণ করে। গবেষণা কর্মীবৃন্দ আত্মসমর্পন করে এবং ভি-টু রকেট তৈরীর ফ্যাক্টরীটি আমেরিকান সৈন্যেরা দখল করে নেয়।

হার্জ পর্বতে এটা ছিল ভূগর্ভস্থিত ফ্যাক্টরী এবং চুক্তি হয়েছিল যে, সেই এলাকাটা রাশিয়ার অধিকারে থাকবে। সময় মত পুরা দস্তুর সামরিক অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে এই এলাকাটি রাশিয়ানদের হাতে সমর্পিত হয় কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্যাক্টরির সব কিছু খালি করে দেওয়া হয়েছে। ভি-টু রকেটের বহুশত অংশ, যাদের অধিকাংশই ফ্যাক্টরীতে সদ্য তৈরী হয়েছিল (অবশ্য তাড়াহুড়াতে অনেক কিছু বাতিল অংশও প্যাক করা হয়েছিল) লিবার্টি নামক জাহাজে ভর্তি করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেগুলিকে রেলরোডের ৩০০ মালগাড়ীতে ভর্তি করা হয় এবং জাহাজে বোঝাই হয়ে নিউ মেক্সিকোতে চলে যায়। নিউ মেক্সিকোতে ইতিমধ্যেই হোয়াইট স্যাণ্ডস প্রুভিং গ্রাউণ্ড স্থাপিত হয়েছিল।

কতকগুলি যন্ত্রাংশ, যেগুলি সংখ্যায় খুব কম ছিল—যেমন, জাইরো ইত্যাদি—সেগুলিকে ঠিকমত অনুকরণ করে নতুন করে তৈরী করতে হলো। কিন্তু ঐসব অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের সাহায্যে প্রায় ৭০টি কার্য্যোপযোগী রকেট তৈরী করে সেগুলিকে উর্ধ্বে উৎক্ষেপ করা হয়। এই রকেট উৎক্ষেপণের ফলে কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর লোকেরা বড় রকেট নাড়াচাড়ায় শিক্ষা লাভ করে। এই রকেট উৎক্ষেপণের ব্যাপার থেকে ভবিষ্যৎ রকেটের গঠন সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। বড় বড় রকেট ছুঁড়তে হলে উৎক্ষেপণ স্থলের অবস্থা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, সেসব তথ্যাদি জানা গেল। সর্বশেষে সেগুলি উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অনুসন্ধান করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তথা-কথিত এই ভি-টু কার্যসূচী ১৯৪৬ সালের মার্চ থেকে ১৯৫১ সালের জুন পর্যন্ত চলেছিল। একটি আমেরিকান ডবলিউ-এ-সি—কর্পোরাল রকেট প্রাক্তন জার্মান ভি-টু রকেটের দ্বারা উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে

২৫০ মাইল উপরে উঠে রেকর্ড স্থাপন করে। এইটাই হয়েছিল এ ব্যাপারের বিশেষ সাফল্য লাভ। এই উচ্চতায় আরোহণের রেকর্ড অনেক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

লাইকার অবদান

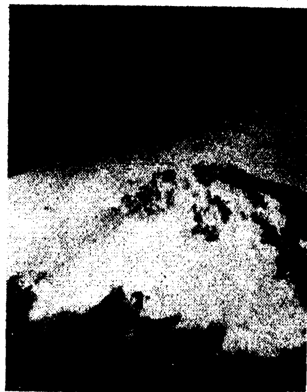
১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর পৃথিবীর চতুর্দিকের কক্ষ পথ থেকে প্রথম স্পুটনিক যখন বিপ্ বিপ্ শব্দ পাঠাচ্ছিল তখন অনেকে প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন—আমেরিকার ভ্যানগার্ড উপগ্রহ প্রথম স্পুটনিকের সঙ্গে যোগদান করবার পূর্বে রাশিয়ানরা দ্বিতীয় আর একটি উপগ্রহকে মহাশূন্যে পাঠাতে সক্ষম হবে কিনা। (ঘটনা যেরূপ দাঁড়িয়েছিল তাতে অবশ্য এক্সপ্লোরার জুপিটার-সি রকেট কর্তৃক পরিবাহিত হয়ে ভ্যানগার্ডের আগেই আকাশে উঠেছিল।) আমি উত্তর দিয়েছিলাম, এবং এই উত্তরই দিতে হতো—"নিশ্চয়ই"। প্রোজেক্ট ভ্যানগার্ডের প্রথম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টায় যাত্রা করবার তখনও অন্ততঃ দশ সপ্তাহ বাকী ছিল। অপর পক্ষে, রাশিয়ানরা পরীক্ষামূলকভাবে দেখিয়েছিল যে, তাদের উপগ্রহ পরিবহণে সক্ষম এক রকম কার্যকরী রকেট আছে এবং একথা খুবই সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি একবার এরকম রকেট তৈরী করতে সুরু করে তবে সে কেবল একটি মাত্র রকেট নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হয় না।

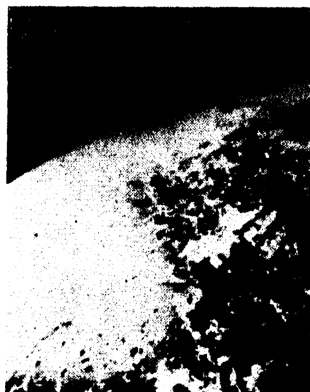
একসঙ্গে তৈরী ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে যে কোন একটি বাছাই করা নমুনা নিলেই যে সেটা ত্রুটিহীনভাবে কাজ করবে—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কৃত্রিম উপগ্রহ পরিবাহী রকেট একটা নতুন ব্যাপার—একটু মোলায়েমভাবে বলতে গেলে বলা যায়—

সেটা ক্রটিহীনভাবেই কাজ করবে বলে আশা করা যায়, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তাহলে স্পষ্টতঃই একথা বুঝা যায় যে, রাশিয়ানরা এইরকম কতকগুলি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করেছে এবং তাদের একটি যখন এরূপ কাজ করতে পেরেছে, অপরগুলিও যে কোন সময়ে সে কাজ করতে পারবে। কাজেই দুই নম্বর স্পুটনিকের আকাশে আবির্ভাব একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টার এত বেশী পার্থক্য।

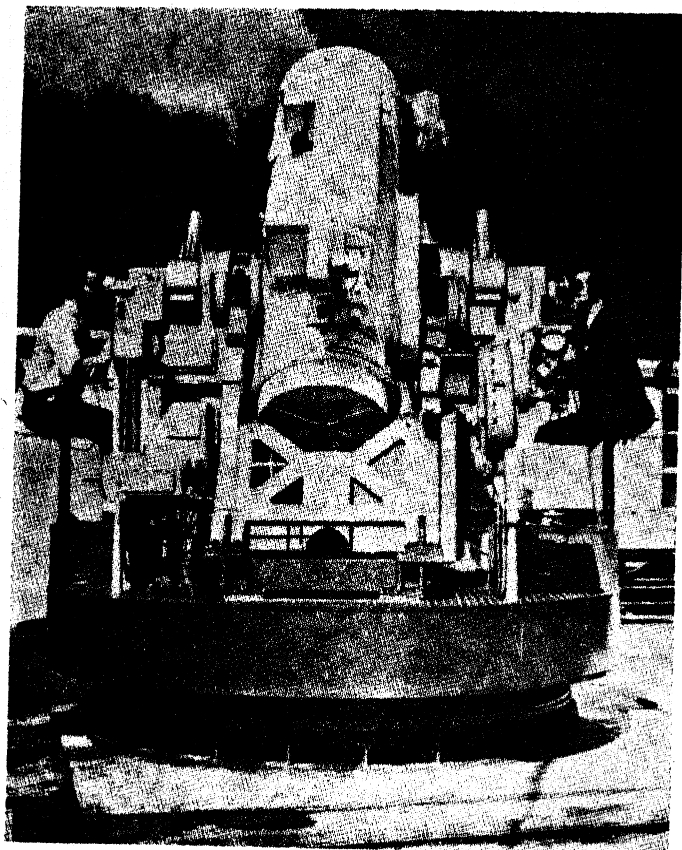
এই পার্থক্যের ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে এক নম্বর স্পুটনিকের নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির কথা একটু আলোচনা করা যাক। ১ নম্বর স্পুটনিক হলো ২৩ ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোলাকার বস্তু। এর ওজন ১৮৪ পাউণ্ড। পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথে এর একবার ঘুরে আসতে লাগে ৯৬ মিনিট। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এই কক্ষপথের সব-চেয়ে নিকটবর্তী স্থানের দূরত্ব ১৫৫ মাইল এবং সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান হলো সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৫৬০ মাইল দূরে। তিন পর্যায়ী রকেটের তৃতীয় পর্যায়টা, যেটা উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করেছিল এবং কোণাকৃতির আবরণটা, বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করবার সময় যেটা উপগ্রহটাকে ঢেকে রেখেছিল—উভয়েই উপ-গ্রহটার সঙ্গে কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

দ্বিতীয় স্পুটনিকটি কক্ষপথে গিয়েও তৃতীয় পর্যায়ের রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি এবং তার কোণাকৃতির আবরণটাকে দূরে ঠেলে দেয় নি। সবগুলিই পরস্পর সংলগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; মোট ওজন ১১১৭·৬ পাউণ্ড। পৃথিবী থেকে কক্ষপথের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানটি হলো, যাকে পেরিজি বলা হয়—১৪০ মাইল দূরে, আর কক্ষপথের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানটি হলো—যাকে বলা হয় অ্যাপোজি—১০০০ মাইলের সামান্য কিছু বেশী দূরে। কাজেই

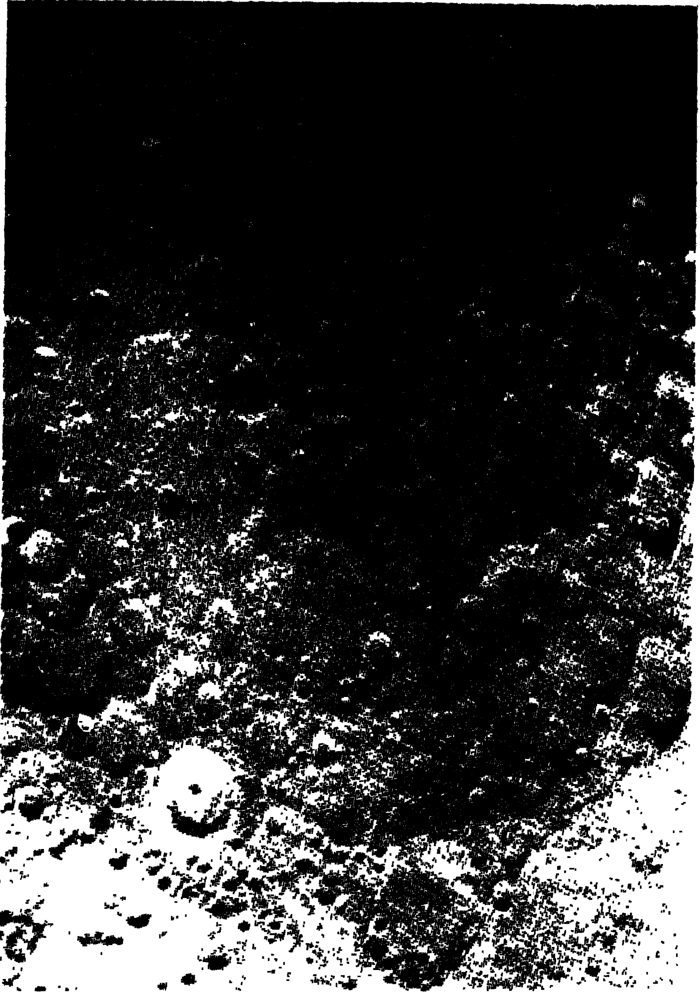





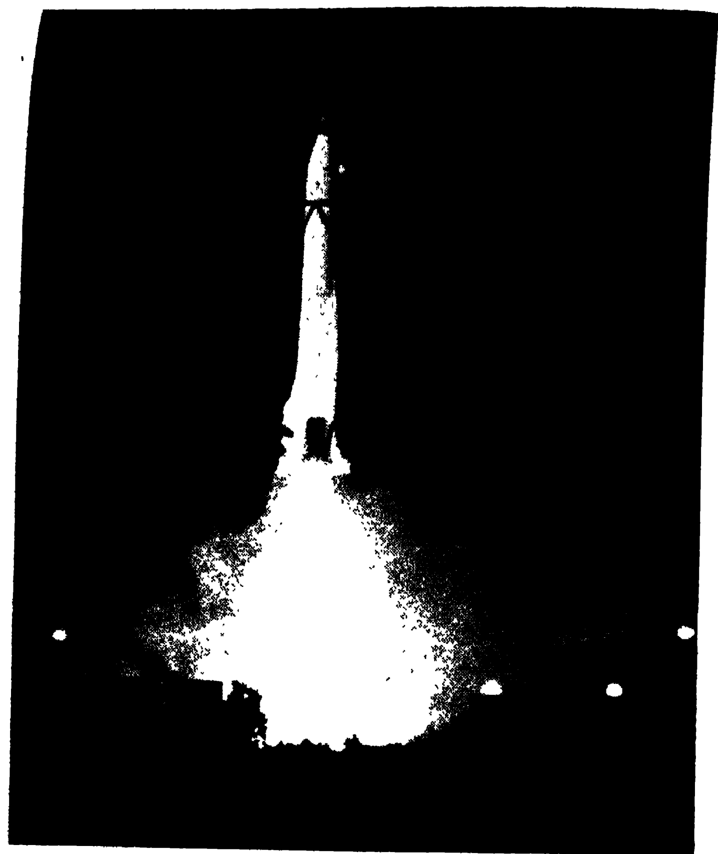
মার্কিন বিমান বাহিনীর থর ক্ষেপণাস্ত্রে রক্ষিত ক্যামেরা শূন্য থেকে
পৃথিবীর এই ছবিগুলি গ্রহণ করেছে



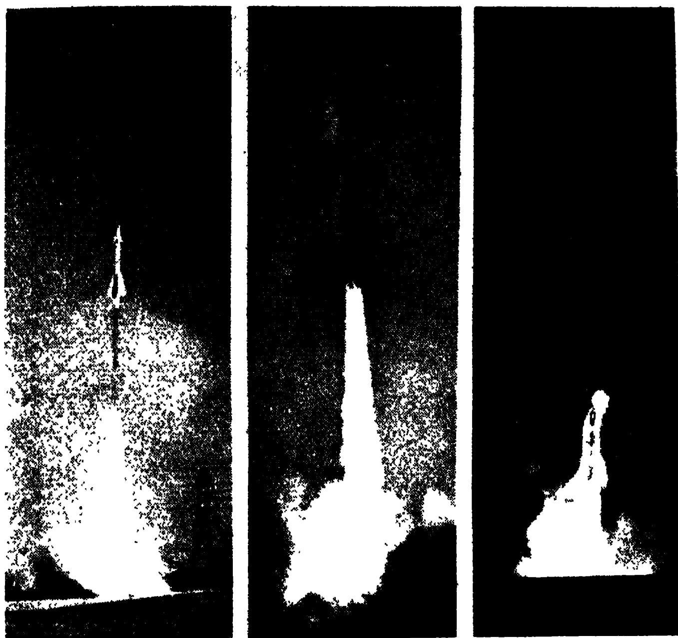
শক্তিশালী ক্যামেরা-টেলিস্কোপ। এরই সাহায্যে চাঁদের ছবি তোলা হয়েছে।



শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে তোলা চাঁদের
উপরিভাগের ছবি।

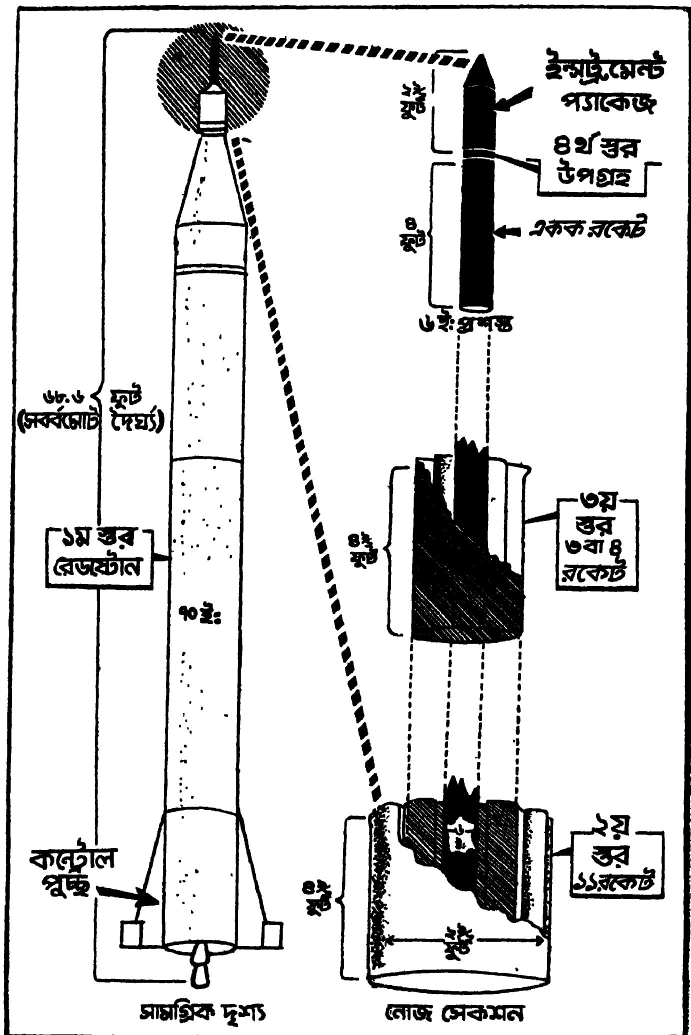


কৃত্রিম উপগ্রহসমেত জুপিটার সি রকেটের
মহাশূন্যে যাত্রা।

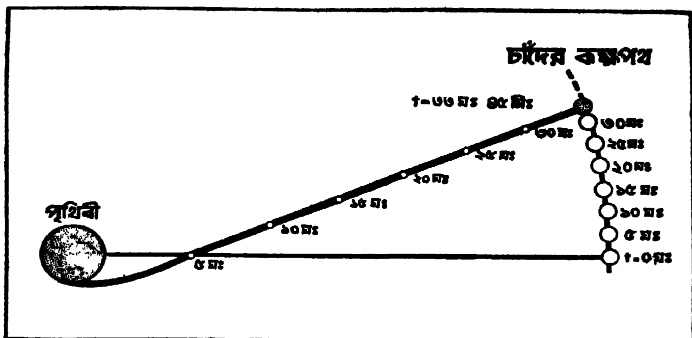


নাইক নাইক-হারকিউলিস নাইক-ক্যাজুন

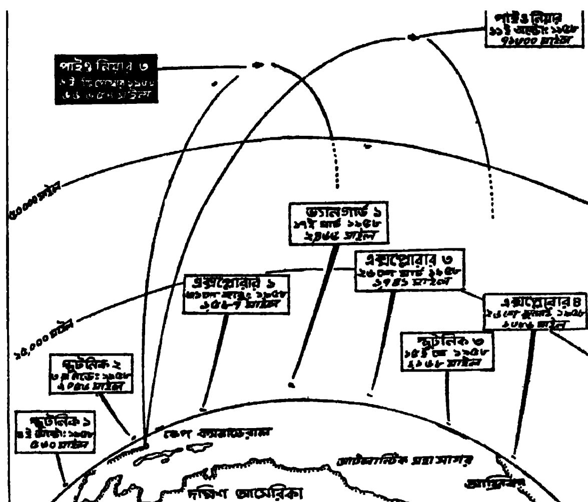
প্রতিরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তিনপ্রকার ক্ষেপণাস্ত্র।



ক্বত্রিম উপগ্রহ বহনকারী রকেটের কলা কৌশল



পৃথিবী থেকে চাঁদ যাওয়ার সম্ভাব্য পথ



যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া কর্তৃক নিক্ষিপ্ত
কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা



মার্কিন নৌবহরের বিমানের ডানার নীচে রক্ষিত সাইডউইণ্ডার
ক্ষেপণাস্ত্র। কয়েক মাইল দূরবর্তী শত্রুপক্ষীয় বিমান
ধ্বংস করতে পারে এই ছোট ক্ষেপণাস্ত্র।

দ্বিতীয় স্পুটনিকের কক্ষপথটা প্রথমটার চেয়ে অনেক বেশী লম্বাটে ছিল ; কাজেই পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসতে এর ৬ থেকে ৮ মিনিট সময় বেশী লাগতো। কিন্তু যে জিনিষটি অধিকাংশ লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল, সেটা হলো—এটার মধ্যে একটি যাত্রী ছিল—ঘন লোমওয়ালা, পাকাপোক্ত রকমের লাইকা নামে ছোট্ট একটি কুকুর। ২নং স্পুটনিকের চুয়ান্নবার পৃথিবী পরিক্রমার পরও কুকুরটি জীবিত ছিল। উপরে ওঠবার ১০০ ঘন্টার পর ব্যাটারী ফুরিয়ে গেলে লাইকা যাতনাবিহীন মৃত্যু বরণ করে।

এই হলো ঘটনা। এখন দেখা যাক—এসবের অর্থ কি! প্রথম কক্ষপথের কথায় আসা যাক—প্রথম স্পুটনিকের কক্ষপথ থেকে দ্বিতীয় স্পুটনিকের কক্ষপথ বেশী লম্বাটে—এতে তেমন কিছু একটা বুঝায় না। এর কারণ এই হতে পারে যে, তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটাতে যখন জ্বালানী পুড়ছিল তখন হয়তো সেটা ঠিক অনুভূমিকভাবে চলে নি। এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, জ্বালানী যখন ফুরিয়ে আসছিল, ঠিক সেই শেষ মুহূর্তটিতে রকেটটার গতি হয়তো আগেরটার চেয়ে কিছুটা দ্রুততর হয়েছিল। দুটি ব্যাপারই আকস্মিক হতে পারে। কিন্তু পূর্ব-পরিকল্পিত হওয়াও বিচিত্র নয়!

দ্বিতীয়তঃ হলো—ওজন। দ্বিতীয় স্পুটনিক যে প্রথমটার চেয়ে বেশী ভারী ছিল—এতে কোন সন্দেহ নেই। তুলনা করতে হলে স্বভাবতঃই প্রথম স্পুটনিকের সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট এবং তার নাকের আবরণ-কোণটির ওজনও ধরতে হবে। কিন্তু সব মিলেও তার ওজন দ্বিতীয় স্পুটনিকের সমান হতো কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় স্পুটনিক হয়তো প্রথম স্পুটনিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ভারী ছিল।

দু-রকমভাবে এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সাধারণ ধারণা এই যে, প্রথম স্পুটনিক আই-আর-বি-এম, অর্থাৎ প্রায়

১৫০০ মাইল পাল্লার (যখন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়) ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। ক্ষেপণাস্ত্রটি মূলতঃ নিশ্চয়ই দুই পর্যায়ী রকেট; উপগ্রহটিকে বহন করবার জন্যে যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্তে তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি যোগ করা হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত ভারী দ্বিতীয় স্পুটনিকটি হয়তো আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের (আই-সি-বি-এম) সাহায্যে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল—যার অর্থ হচ্ছে ৩০০০ মাইল বা তারও বেশী পাল্লা।

তবুও খুব সম্ভব এগুলি অনুমানমূলক। মোটের উপর রাশিয়ানরা একথা বলেছে যে, তাদের আই-সি-বি-এম অর্থাৎ আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আছে। কিন্তু এটাও সম্ভব যে, প্রথমদুটি পর্যায়ের জন্যে সেই একই মাঝারী পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আই-আর-বি-এম) ব্যবহৃত হয়েছিল এবং অতিরিক্ত ভার যথাস্থানে ঠেলে দেওয়ার জন্যে বৃহত্তর এবং অধিকতর শক্তিশালী তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি যোগ করা হয়েছিল। কক্ষ পথে এক পাউণ্ড ওজন তুলতে হলে ১৫০ পাউণ্ডেরও বেশী জ্বালানীর প্রয়োজন হয়; কাজেই খুব সোজা হিসেবেই দেখা যায় যে, ২নং স্পুটনিকের জন্যে ২,০০,০০০ পাউণ্ডেরও বেশী জ্বালানীর প্রয়োজন হয়েছিল। তাছাড়া রকেটের নীচের পর্যায় দুটিও ভারশূন্য নয়; কাজেই উৎক্ষেপণের সময় এর ওজন দাঁড়িয়েছিল সম্ভবতঃ ৩,০০,০০০ পাউণ্ডের কাছাকাছি। এর অর্থ হলো, প্রথম পর্যায়ের (নীচের দিকের) রকেট-মোটরগুলি ৬,০০,০০০ পাউণ্ডের মত ধাক্কা প্রদানে সক্ষম। এথেকেই একে আই-সি-বি-এম অর্থাৎ আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মত মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, কুকুরের কথা—কুকুরটা উর্ধ্বোরোহণের ধকল কাটিয়ে জীবিত ছিল—এটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। আমেরিকার

গবেষণাকারী বিজ্ঞানীরা প্রায় ৭ বছর পূর্বে দুটি বানর এবং দুটি ইঁদুরকে পঞ্চাশ মাইল উর্ধ্বে তুলে তাদের জীবন্ত ফিরিয়ে এনেছিলেন। রাশিয়ানরা কুকুরকে ৬০ মাইল উর্ধ্বে তুলেছিল এবং বার বার একই কুকুরকে উর্ধ্বাকাশে পাঠিয়েছিল। এসব পরীক্ষার ফল থেকে স্বভাবতঃই বোঝা যায়—প্রাণীদের বেঁচে থাকবার উপযোগী ব্যবস্থা সমন্বিত বায়ুনিরোধক কক্ষের যে সমস্যা ছিল, তার সমাধান করা হয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা হলো এই যে, কুকুরটা ভারহীন অবস্থায় ১০০ ঘণ্টা থাকার পরেও বেঁচেছিল!

মহাশূন্য সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেন, এই প্রলম্বিত ভারশূন্যতা সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের একান্ত অভাব। অন্য সব কাজই জমির উপর পরীক্ষা করে দেখা যায় বা অনুকরণ করা যায়, কিন্তু ভারশূন্যতার পরীক্ষা করা যায় না, তবে যান্ত্রিক শক্তিতে নিম্নগতির সময় যদি জোরে জেট প্রবাহিত করা যায় ভারশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে ঠিক মতই ভারশূন্যতা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের জন্যে। সমস্যা হলো—এই স্বল্পস্থায়ী অবস্থার সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার বিষয় কিছু প্রমাণিত হয় কি? হয়ত মানুষের শরীর আধ মিনিটের জন্যে এ অবস্থা সহ্য করতে পারে কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্যে পারবে না।

এই বছরের প্রথম দিকে টেক্সাসের-র‍্যাণ্ডলফ বিমানবাহিনীর শিবিরে বিমান-বাহিনীর মহাশূন্য ভেষজ বিভাগ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম তখন গবেষণা কর্মীদের সঙ্গে অবশেষে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, মাত্র আধ মিনিটের zero-g (ভারশূন্যতার বৈজ্ঞানিক সাঙ্কেতিক শব্দ) কি প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট? আমরা একটা পরীক্ষাসাপেক্ষ (এবং কিছুটা রহস্যস্থলে) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, "যদি zero-g দশ মিনিটের মধ্যে কারো মৃত্যু

ঘটাতে না পারে, তবে আর কখনও পারবে না।" ১০০ ঘণ্টার পরেও ভারশূন্য অবস্থায় যখন রাশিয়ান কুকুর জীবিত ছিল—তখন এ অবস্থায় আর মরতে পারে না। কাজেই মানুষ নিঃশঙ্কচিত্তে কক্ষপথে যেতে পারে।

এক্সপ্লোরারের অবদান

১৯৫৮ সালের ১১ই জানুয়ারী, মধ্যরাতের একঘণ্টা পাঁচ মিনিট পূর্বে ১৯৫৮—আল্‌ফা আকাশে আবির্ভূত হয়। এটা হলো তার 'সরকারী' নাম। এটা হলো আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ—নাম রাখা হলো—এক্সপ্লোরার।

এই সরকারী নামকরণের সম্ভাব্য রহস্য পরিষ্কার করতে গেলে এইটুকু বলা যায় যে, নামকরণের প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের অধ্যাপক ডঃ ফ্রেড এল. হুইপল্ নামকরণের এই রীতি উদ্ভাবন করেন। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি যে বছরে কক্ষপথে স্থাপন করা হবে, সেই বছর উল্লেখের পরে গ্রীক বর্ণমালার একটা অক্ষর বসিয়ে তাদের নামকরণের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং ১ নম্বর স্পুটনিকের নাম রাখা হয়—১৯৫৭ আল্‌ফা। ২নং স্পুটনিকের নাম করা হয় ১৯৫৭-বিটা ইত্যাদি। কৃত্রিম উপগ্রহটা কোন্ দেশের, তার উল্লেখ তেমন প্রয়োজনীয় নয়। কোন্‌টার পর কোন্‌টা উর্ধ্বাকাশে পাঠানো হয়েছে, তদনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়।

সেদিন ঠিক রাত ১০টা ৪৮ মিনিটে এক্সপ্লোরার আকাশ-যাত্রা সুরু করে; কিন্তু ১০টা ৪৮ মিনিটে সে ছিল একটা বোঝাই রকেট মাত্র। কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমা সুরু না করা পর্যন্ত সে

১৯৫৮-আল্‌ফা হয়নি। যে রকেটটি উপগ্রহটাকে কক্ষপথে পৌঁছে দেয়, সেটি ছিল জুপিটার-সি নামে জুপিটার শ্রেণীর অনুসরণে নির্মিত এক প্রকার রকেট। এই রকেট কয়েকটি বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত। প্রথম পর্যায়ে ছিল তরল জ্বালানী-চালিত লম্বাটে ধরণের রেডষ্টোন রকেট। সাধারণতঃ তরল অক্সিজেনের সাহায্যে অ্যালকোহল পুড়িয়ে রেডষ্টোন রকেট চালিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যালকোহলের পরিবর্তে প্রধানতঃ হাইড্রাজিন নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে প্রস্তুত জ্বালানী ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে কতকগুলি কঠিন জ্বালানীর রকেট বৃত্তাকারে সাজিয়ে পরস্পরে সঙ্গে বল্টু এঁটে ঘেরাটোপের মত করা হয়েছিল।

তৃতীয় পর্য্যায়ে কঠিন জ্বালানী-চালিত ঐ একই রকমের কতকগুলি রকেট নিয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত ছোট্ট একটি বেষ্টনী দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেট বেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়টি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের মতই বৃত্তাকারে সজ্জিত কতকগুলি কঠিন জ্বালানীর রকেট, কিন্তু দ্বিতীয়টির চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট এবং সেটিকে বসানো হয়েছিল দ্বিতীয় বেষ্টনীটির মধ্যে। সর্বশেষ চতুর্থ পর্যায়ে ছিল ঐ একই রকমের একটি মাত্র কঠিন জ্বালানীর রকেট। সেটি বসানো হয়েছিল তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটির উপরে। বিভিন্ন যন্ত্র এবং কৃত্রিম উপগ্রহটিকে চতুর্থ পর্যায়ের রকেটের অগ্রভাগে এঁটে দেওয়া হয়েছিল।

কঠিন জ্বালানী-চালিত জুপিটার সি রকেটের তিনটি পর্যায়ে অগ্নিসংযোগ করবার পূর্বে সেগুলির জন্যে আরও কিছু করতে হয়েছিল। বিদ্যুৎ-চালিত একটা মোটরের সঙ্গে সেগুলিকে ঘূর্ণনক্ষম একটা মঞ্চের উপর স্থাপন করবার পর বাইরে থেকে বিদ্যুৎ-স্রোত এনে ঐ মঞ্চটাকে ঘোরানো সুরু হলো। অনেকেই মনে করেন, উপগ্রহটাকে গতিপথে স্থিরভাবে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যেই মঞ্চটাকে

এভাবে ঘোরানো হয়; কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এভাবে ঘোরাবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্বে বলা হয়েছে যে, কঠিন জ্বালানী-চালিত কতকগুলি রকেট দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃত্তাকারে সাজানো রয়েছে। অগ্নিসংযোগ করামাত্র ঠিক একই সময়ে অগ্নিপ্রজ্জলিত হওয়া দরকার। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক সেইরূপই ঘটে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এমনও হতে পারে যে, অন্য রকেটগুলির জ্বালানীতে আগুন ধরবার এক সেকেণ্ডের চতুর্থাংশ সময় পূর্বেই একটি রকেটের জ্বালানী পুড়তে সুরু করলো, অথবা এমনও হতে পারে, অন্য সবগুলি রকেটের জ্বালানীতে আগুন ধরে গেছে, তার এক সেকেণ্ডেরও কম সময় পরে বাকী একটিতে আগুন ধরলো। উভয় ক্ষেত্রেই এর ফলে গতিশীল রকেট একদিকে একটু কাত হয়ে যেতে পারে— যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বৃত্তাকারে সজ্জিত রকেটগুলির কোন একটার জ্বালানীতে একটু আগে বা পরে আগুন ধরবার ফলে যে অসুবিধা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা, তাকে যথাসম্ভব হ্রাস করবার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ জিনিষটাকে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভ্যানগার্ড উপগ্রহের জন্যে যে কক্ষপথ পরিকল্পিত হয়েছিল, এক্সপ্লোরার সেই কক্ষেরই প্রায় কাছাকাছি কক্ষে পৃথিবী পরিক্রমা সুরু করে। পৃথিবী থেকে ভ্যানগার্ড উপগ্রহের কক্ষপথের সবচেয়ে নিম্নতম দূরত্ব অর্থাৎ পেরিজি অনুমিত হয়েছে ২০০ মাইল এবং উচ্চতম দূরত্ব অর্থাৎ অ্যাপোজি হলো ১৪০০ থেকে ১৬০০ মাইলের মধ্যে। এক্সপ্লোরারের পেরিজি হলো ২২০ মাইল এবং অ্যাপোজি ১০০০ মাইল। ২নং স্পুটনিকের মত উপগ্রহটিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের রকেটটিতে রাখা হয়েছিল এবং এর দ্বারাই সেটা কক্ষপথে সংস্থাপিত হয়। রকেটের শূন্য খোল এবং যন্ত্রাদির মোট ওজন হলো ৩০

পাউণ্ড। এক্সপ্লোরারের আকার (রকেটের খোলসহ) ৬ ইঞ্চি চওড়া ৮০ ইঞ্চি লম্বা একটা চোঙের মত। এটা প্রায় ৪ বছর কক্ষপথে থাকবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে—বর্তমানে যে সব রকেট দেখা যায়, তাদের সমন্বয়ে সামান্য কিছু পরিবর্তন করে জুপিটার-সি নামে যে রকেট তৈরী হয়েছে, সেটা প্রথম বারের চেষ্টাতেই কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সাফল্য লাভ করলো, অথচ কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে তৈরী ভ্যানগার্ড রকেটের বারংবারের চেষ্টা ব্যর্থ হলো কেন? এর উত্তরে বলা যায়—জুপিটার-সি-এর সাফল্য লাভের কারণ হলো এই যে, পুরাতন অন্যান্য রকেটর বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এই রকেট তৈরী হয়েছিল। অন্যান্য রকেটের নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে জুপিটার-সি টাইপের রকেটই ছিল পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত এবং এগুলি প্রচুর পরিমাণেই তৈরী হয়েছিল। অপর দিকে—ভ্যানগার্ড হলো এক রকমের নতুন রকেট।

ভ্যানগার্ড রকেটের প্রথম পর্যায়কে পরীক্ষামূলক ভাবে বেশ কয়েকবার উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল এবং তাতে মাত্র দু-বার ছাড়া আর প্রত্যেক বারেই সাফল্য লাভ হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটিকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উৎক্ষেপণ করে পরীক্ষা করা হয়নি। তৃতীয় পর্যায়টিকে এর প্রস্তুতকারীরা কয়েকবার অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষেপণ করেছিলেন। মোটের উপর সম্পূর্ণ রকেটটির কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়—ভ্যানগার্ড হলো সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরিণত রকেট এবং প্রত্যেক নতুন রকেটকে যেমন নানা রকম ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হতে হয়েছে, এর পক্ষেও যে সব অবস্থার ভিতর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। ভ্যানগার্ডকে এখন অবশ্য কাজের উপযোগী করে

তোলা হয়েছে, যদিও উপগ্রহ নিক্ষেপণের কাজে পরীক্ষোত্তীর্ণ জিনিষের উপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত।

অবশ্য কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে গবেষণা সংক্রান্ত যেসব কাজ করতে হবে, বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সেগুলিকে বার বার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এক্সপ্লোরার কিন্তু ইতিমধ্যেই অতি চমৎকার এবং উৎসাহজনক কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার জন্যে এক্সপ্লোরারের মধ্যে যন্ত্রাদি স্থাপন করা হয়েছিল।

(১) এর অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা, যাকে কেবিনের তাপমাত্রা বলা যেতে পারে। পূর্বেকার হিসেবে বলা হয়েছিল যে, পৃথিবীর কাছাকাছি থাকবার সময় মহাকাশ-যানের কেবিনের তাপমাত্রা প্রায় ৭০° ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত হবে। এক্সপ্লোরার থেকে যে খবর জানা গেছে তাতে দেখা যায়—সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫৫° ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৮৫° ফারেনহাইট।

(২) বর্হিমণ্ডলের তাপমাত্রা—অনুমান করা হয়েছিল যে, সেখানকার তাপমাত্রা খুব বেশী হবে—কেউ স্পর্শ করতে পারলে নিশ্চয়ই বেশ উত্তাপ অনুভূত হতো, অবশ্য ধাতব পদার্থকে নরম করে ফেলবার মত উত্তাপ নয়। এক্সপ্লোরারের তথ্য থেকে এ অনুমান সমর্থিত হয়েছে।

(৩) পৃথিবীর নিকটবর্তী শূন্যমণ্ডলে কি পরিমাণ মহজাগতিকরশ্মির সম্মুখীন হতে হয়েছিল এক্সপ্লোরার পরিবাহিত একটি যন্ত্র সে সম্বন্ধে খবর দিয়েছে। পূর্বে যা অনুমান করা হয়েছিল, এই সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু এসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে আরও বার কয়েক পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন হবে।

(৪) মহাশূন্যে বিচরণকারী ছোট-বড় অগণিত মহাজাগতিক

ধূলিকণার সঙ্গে কতবার সংঘাত হয়েছে, সে বিষয় জানবার জন্যে অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে "উল্কা-সংঘাত জ্ঞাপক মাইক্রোফোন" এর বহির্গাত্রে প্রোথিত করা ছিল। এই যন্ত্র থেকে মহাজাগতিক ধূলিকণার সঙ্গে সংঘাতের যে সংখ্যা পাওয়া গেছে, তাও পূর্বে অনুমিত সংখ্যার চেয়ে কম। অবশ্য এ-বিষয়েও পুনরায় বার কয়েক পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে যে সব পরিমাপাদি করা হয়েছে, তাদের কোন কোনটা সম্বন্ধে পরবর্তী গবেষণা-উপগ্রহের সাহায্যে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং সেগুলি এমন সব যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যাবে, যা পূর্বে কখনও উপগ্রহের কক্ষপথে পাঠানো হয় নি। বছর খানেকের মধ্যেই মহাশূন্যের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এমনভাবে জানা দরকার যাতে গবেষণা সংক্রান্ত উপগ্রহ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে উন্নত ধরণের উপগ্রহ এবং যাত্রীবাহী উপগ্রহ নির্মাণের নক্সাদির পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

"বিগ ব্রাদার্স্" লক্ষ্য করবে না

খুব বেশী দিনের কথা নয়—কোন একটি লোক দু-দিনের বিতর্কে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সে বলেছিল—পেন্টাগণের একেবারে অভ্যন্তরভাগের কোথাও এক বিশ্রাম-কক্ষে "বিগ ব্রাদার্স্" নামে একটা পরিকল্পনা নিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। এটা অবশ্য, অরওয়েলের ভবিষ্যৎ একনায়কত্ব সম্বন্ধে ১৯৮৪ নামক উপন্যাসের সর্বদ্রষ্টা "বিগ ব্রাদার্স্"-এর প্রতি একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত। বিতর্কের বিষয়ীভূত "বিগ ব্রাদার্স্" পরিকল্পনাটা ছিল সম্ভবতঃ টেলিভিশন সমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে:—পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে

যা কিছু ঘটছে, টেলিভিশনের সাহায্যে দেখে নিয়ে কৃত্রিম ঊর্ধ্বাকাশ থেকে সবকিছু তার মালিকদের জানিয়ে দেবে। আমি অবশ্য জানি না, যে লোকটি এই "বিগ ব্রাদার্স্" গল্পের খবরের জন্যে দায়ী, সে কি শুনেছিল এবং কি বুঝেছিল। ব্যাপারটা কিন্তু অত সোজা নয়।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, টেলিভিশন সমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা হচ্ছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে বিজ্ঞানীদের একটা কাজ হলো—সামনের দিকে দেখা, কি করা যাবে তার নির্দেশ দেওয়া এবং তাঁরা কি করতে চান এবং কেন—সেকথা বুঝিয়ে বলা। কাজেই একদল বিজ্ঞানী যখন ১৯৫৮ সালে পৃথিবী পরিক্রমার উদ্দেশ্যে কক্ষপথে পাঠাবার জন্যে কতকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, অপর বিজ্ঞানীরা তখন থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই চিন্তা করতে সুরু করেছেন যে, প্রথম দলের কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণের পর আর কি কি কাজ করা যেতে পারে।

অন্যান্য জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস, পরবর্তী সময়ে (ধরা যাক এখন থেকে চার পাঁচ বছর পরে) যা কার্যোপযোগী হবে বলে মনেহয়, সেটা হচ্ছে টেলিভিশন-উপগ্রহ। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৩,০০০ বা ৪,০০০ মাইল উপরে পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী একটা উপগ্রহ কক্ষ-পথে স্থাপন করতে হবে। এই উপগ্রহের মধ্যে একটি টেলিভিশন-ক্যামেরা থাকবে এবং তাছাড়া এমন একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকবে যাতে ক্যামেরাটা সর্বদাই সোজা নীচুদিকে মুখ করে থাকতে বাধ্য হয়। ক্যামেরা এবং নীচু দিকে লক্ষ্য স্থির রাখবার যান্ত্রিক কৌশল উভয়েই সৌরশক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে। কারণ উপগ্রহের

মধ্যে অন্য কোন রকম শক্তির উৎস স্থাপনের ব্যবস্থা করলেও সেটা বেশী দিন স্থায়ী হবে না।

এই ক্যামেরাতে যেসব টেলিভিশন ছবি উঠবে, সেগুলি হবে পৃথিবীর ঘটনা এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠের গ্রাহক যন্ত্রের জন্যে সেগুলিকে 'ব্রডকাষ্ট' করা হবে। সম্পূর্ণ জিনিসটার উদ্দেশ্য হবে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানকারীদের তথ্যাদি সরবরাহ করা। তাঁদের এসব তথ্যাদি জানবার প্রয়োজন খুবই বেশী অথচ সাধারণতঃ জানতে পারেন না। তাঁদের নিজেদের দুঃখের এবং অনেক সময় জন-সাধারণের দুঃখের বিষয় হচ্ছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানকারীরা সত্যই খুব কম খবরই সংগ্রহ করতে পারেন। নিম্নোক্ত তথ্যাদি থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় একশ' ভাগের এক ভাগ। প্রথমে এটা অদ্ভুত শোনায় বটে, কিন্তু যদি একথা স্মরণ করা যায় যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের শতকরা ৭৫ ভাগই সমুদ্র, তাহলে কথাটা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে। এখন এই এক শতাংশ ভূখণ্ডে আবহাওয়া-ষ্টেসনগুলি সুবিন্যস্ত রয়েছে। হিসেব করলে দেখা যাবে— ক্যানাডা, মেক্সিকো, উত্তর ইউরোপ এবং অন্য কয়েকটি বেশ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে প্রায় পাঁচ শতাংশ ভূভণ্ড অনবরত একই-ভাবে আবহ-তত্ত্ববিদ্‌দের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণাধীনে রয়েছে। বাকী অংশগুলি অবশ্য এরূপ অবস্থায় নেই।

কিন্তু যিনি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেন, আকাশে তাঁর যদি টেলিভিশনযুক্ত একটা কৃত্রিম উপগ্রহ থাকতো, তাহলে টেলিভিশনের পর্দায় ভূপৃষ্ঠের অর্ধাংশ তিনি একবারেই দেখতে পেতেন। অবশ্য তিনি ঠিক সে সময়ে পৃথিবীর অপর অর্ধাংশ, যেখানে তখন রাত্রির অন্ধকার বিদ্যমান, মোটেই দেখতে পেতেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ

অসুবিধা হলো এই যে, একে রঙীন টেলিভিশন করা দরকার ; কারণ আবহাওয়া-বিদ্‌কে বিচার করে দেখতে হবে নীল এবং সাদার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম ছায়ারেখার দ্বারা এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের দরুণ এই সাদা রংটি উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাদা-কালো ছবিতে কাজে লাগবার মত পরিষ্কার কিছুই বোঝা যাবে না।

৩,০০০ মাইল দূরে মহাশূন্যের একটা কিছু থেকে পৃথিবীকে যেরূপ দেখায় আবহবিদেরা সবশেষে যখন তার একটা রঙীন চিত্র পেয়ে যাবেন তখন তাঁদের পক্ষে এখন যা স্বপ্নের বিষয়ীভূত, অনেকটা পরিষ্কার ধারণা করবার সুবিধা হবে। তাঁরা দেখতে পাবেন এমন এক একটা ঘটনা—দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, যেমন—প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে বায়ুমণ্ডলের বিক্ষুব্ধ অবস্থা—যার বিষয় অন্য কোন রকমে সন্দেহ করবারও কারণ ঘটতো না। এর অবস্থানস্থল জেনে নেবার পর এসম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি জানবার জন্য ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী চেক পয়েণ্টে জানিয়ে দিতে পারতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদের হয়তো চেক পয়েন্টকে জানিয়ে দেবারও প্রয়োজন হবে না। আবহাওয়া-ষ্টেসনের নিজস্ব গ্রাহক যন্ত্রের পর্দায় সমস্যার বিষয় লিপিবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই-তারা কাজে লেগে যেতে পারবে। আমরা জানি—এই পদ্ধতি কার্যকরী হবে। বেশী দিনের কথা নয়, উর্ধ্বাকাশ যাত্রী একটা রকেট থেকে তোলা ছবিতে দৈবক্রমে একটা ঝড় সংঘটিত হবার অবস্থা ধরা পড়ে। এটা ছিল ঝড়ের একটা পূর্বলক্ষণ মাত্র—পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নি। কিন্তু এটাও এমন একটা ব্যাপার যে, ভূমির উপর অবস্থিত ষ্টেশনগুলি এই ঝড়ের অস্তিত্বের বিষয় মোটেই টের পায়নি।

হ্যাঁ, "বিগ ব্রাদর্স" এর কথা তবুও উল্লেখ করা দরকার।

বিব্রত হবার প্রয়োজন নেই—অতি ক্ষুদ্র জিনিষ টেলিভিশন পর্দা সম্ভবতঃ বিশ মাইল পর্যন্ত জিনিস দেখাতে পারবে।

মহাশূন্য পরিভ্রমণ ও আইন

এক নম্বর স্পুটনিক আকাশে উঠে পৃথিবী পরিক্রমা সুরু করবার দিন দুই পর টেক্সাস সহরের একজন কাউন্সিলর এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, আমাদের সহরের উপর দিয়ে রাশিয়ান উপগ্রহ উড়ে যাওয়া বে-আইনী ঘোষণা করা হোক। এই প্রস্তাবে কিছুই হলো না, কারণ কেউ একে সমর্থন করে নি। এই প্রস্তাবের বিবরণ পাঠ করে জনসাধারণের কেউ কেউ মৃদু হাস্যে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলো, কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করলো এবং অনেক হেসেই উড়িয়ে দিল। এতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে যেটা সাধারণ লোকে ধরতে পারে নি—সেটা হলো এই যে, এই প্রস্তাবটি বে-আইনী প্রতিপন্ন হয়ে থাকলে, প্রস্তাবকের পক্ষে আর একটা যুক্তিও আসে এ-হিসেবে যে মহাকাশ পরিভ্রমণও তাহলে আইনের গণ্ডী-বহির্ভূত নয়।

একবার যদি এরকম আইনের গণ্ডীর কথা চিন্তা করা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকেরই মনে নানারকম আইনানুগ প্রশ্ন উঠতে পারে। ধরে নেওয়া যাক—বৃহত্তর ওশেনিয়ার রিপাব্লিক সর্বপ্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে তার জাতীয় পতাকা ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্যেই কি চন্দ্র তার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে? অথবা যদি বৃটিশের একটা মহাকাশ-যান মহাকাশে যাত্রার পথে স্পেনের অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে যায়, স্পেন কি তাহলে আপত্তি করতে পারে?

প্রকৃত প্রস্তাবে মহাশূন্য সম্পর্কিত আইন-কানুন সম্পর্কে এ

পর্যন্ত অনেক কিছু লেখা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের আইন বিভাগের অস্কার স্যাকৃটার প্রথম এ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৫১ সালে মহাকাশ পরিভ্রমণ সংক্রান্ত হেডেন প্ল্যানেটেরিয়াম সিম্পোসিয়ামে সেটি সর্বপ্রথম উপস্থাপিত হয়। অস্কার স্যাকৃটার তখন বলেছিলেন যে, আইনানুগ যুক্তি অনুযায়ী পৃথিবীর বহির্ভাগের মহাকাশ মুক্ত সমুদ্রের মতই বিবেচিত হওয়া উচিত—সবাই ব্যবহার করবে, কিন্তু কারুরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

আন্তর্জাতিক এবং সমুদ্র সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ এবং আইনজ্ঞেরা এ-সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন এবং তাঁরাও উক্ত অভিমতই সমর্থন করেন। কিন্তু এতে কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে—সবচেয়ে প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, মহাশূন্যে যেতে হলে প্রথমে বায়ু-মণ্ডলের ভিতর দিয়ে না গিয়ে উপায় নেই। এবং বায়ুমণ্ডলের উপর বিভিন্ন জাতির অধিকার রয়েছে। এর আইনগত সংজ্ঞা হলো—'বায়ুমণ্ডলের উপর তাদের সার্বভৌমিক অধিকার'। প্রত্যেক জাতিই তাদের দেশের উপরকার আকাশে যা খুসী করতে পারে এবং কোন দেশের সীমান্তে সমুদ্র থাকলে উপকূল থেকে তিন মাইল পর্যন্ত সমুদ্রের উপর তাদের আধিপত্য থাকবে। তিন মাইল বিস্তৃত সমুদ্র অঞ্চল সাধারণতঃ দেশের স্বীকৃত "সম্পত্তি" রূপে পরিচিত।

কিন্তু এতেও আইনগত একটা মজার ব্যাপার আছে। সমুদ্রের এই তিন মাইলের উপর দেশের এই যে আধিপত্য বা সার্বভৌমত্ব—এটা কিন্তু চরম নয়—অর্থাৎ কোন জাহাজ এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে যাবার সময় অন্য দেশের এই তিন মাইল এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হলে তাদের বিনানুমতিতেই সে তা করতে পারে। এটাকে বলা হয়—"নিরুপদ্রব যাত্রাপথের অধিকার।" এই

অধিকার মালিকের দয়া প্রসূত অধিকার দানের মত নয়। আইন-জ্ঞেরা বলেন, যুক্তিগত বিচার অনুযায়ী বাতাসের উপরেও কতকটা এরকমের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সাধারণভাবে বলতে গেলে যুক্তিটা দাঁড়ায় এ-রকম—কোন একটা দেশের উপরে বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তর হবে সে দেশের নিজস্ব সম্পত্তি। বিশেষ অনুমতি ব্যতীত অথবা দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি ব্যতীত কেউ এই নিম্নাকাশ ব্যবহার করতে পারবে না। তার পরবর্তী ঊর্ধ্বতন বাতাসের স্তরও অবশ্য সে দেশেরই অধিকারে থাকবে বটে, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যেকেই সে পথে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। তার পরেই হলো মহাশূন্য—সেটা কারো অধিকারেই থাকবে না।

আর যেটুকু করবার বাকী থাকবে, সেটুকু করবে কোন একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন—সেটা হলো—আকাশের এই বিভিন্ন স্তরের উচ্চতা স্থিরীকরণ; সম্ভবতঃ প্রথম ত্রিশ মাইল নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। সেখান থেকে ১৫০ অথবা ২০০ মাইল বাতাসের স্তরে প্রত্যেকেরই নিরুপদ্রব যাতায়াতের অধিকার থাকবে। তার উপরে হলো মালিকশূন্য মহাকাশ। এই যুক্তির মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সমুদ্রও মালিকশূন্য। কাজেই তিন মাইল দূরে সমুদ্রের উপরে মালিকশূন্য সমুদ্র এবং মালিকশূন্য আকাশ মিলিত হচ্ছে; আইনতঃ সমুদ্রের উপরে কোন আকাশ থাকবে না।

কাজেই মহাশূন্যযাত্রী কোন আকাশযান ইংল্যাণ্ড ছেড়ে স্পেন অতিক্রম করবার সময় স্পেনের উপকুল রেখা থেকেই ত্রিশ মাইলেরও বেশী উপর দিয়ে যেতে হবে। যদি সেটা করা না যায় তবে এবিষয়ে অ্যাঙলো-স্প্যানিস চুক্তি না থাকলে আকাশ-যানকে সমুদ্রের উপর অপেক্ষা করতে হবে।

এখন চন্দ্রপৃষ্ঠে পতাকা নিক্ষেপ করে সেখানের দখলীসত্ত্ব দাবী করবার বিষয়ে কি হবে ? আইনজ্ঞেরা এখনও সুনির্দিষ্ট ভাবে এ-বিষয়ে আলোচনা করেন নি; কিন্তু ভূভাগে বিশেষতঃ দ্বীপগুলি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুযায়ী একটা অনুমান করা যেতে পারে—এই আইন কিরূপ ভাবে বিধিবদ্ধ হবার সম্ভাবনা। অতীতে কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন সমুদ্র-যাত্রা থেকে ফিরে এসে যদি বলতো যে, সে অমুক স্থানে, অমুক রকমের একটি দ্বীপ দেখে এসেছে এবং তার চতুর্দিকে জাহাজে ঘুরে মহামান্য রাজা জেডিয়ার XIII-এর নামে সেই দ্বীপের দখল নিয়েছে তাহলে এটুকুই দখলী সত্ত্বের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতো। কিন্তু আজকাল আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে—দ্বীপটি সে প্রদক্ষিণ করেছিল বটে, কিন্তু দ্বীপে অবতরণ করেনি কেন ? তারপরে অনুসন্ধান করে দেখবার চেষ্টা করবে—অন্য কেউ সেখানে অবতরণ করেছিল কিনা। যদি অন্য কেউ অবতরণ করে থাকে, তবে দূর থেকে দখলের দাবী মূল্যহীন বিবেচিত হবে।

এরূপ ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছিল। অ্যান্টার্কাটিক মহাসাগরের লিটল বোভেট দ্বীপটি এভাবেই সর্ব প্রথমে একজন ইংরেজ ক্যাপ্টেন কর্তৃক গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। তখন আবহাওয়া এমনই খারাপ ছিল যে, তিনি সেই দ্বীপে অবতরণ করতে পারেননি। এক শতাব্দীরও বেশী দিন পরে নরওয়ের নাবিকেরা একখানি জাহাজ যোগে সেখানে গিয়ে বোভেট দ্বীপে অবতরণ করে তাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় গ্রেট বৃটেনের হাত থেকে বোভেট দ্বীপ নিয়ে নেয় এবং তার উপর নরওয়ের অধিকার সাব্যস্ত করে। *

কিন্তু এটুকুই গল্পের সব শেষ নয়। ইংল্যাণ্ডের লোক অবতরণ

করতে পারেনি, কিন্তু নরওয়ের লোকেরা পেরেছিল। যাহোক, তারা অবতরণ করেও আবার ফিরে এসেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য কেউ যদি খারাপ আবহাওয়ার দরুণ (যা বোভেট দ্বীপের পক্ষে অসম্ভব নয়) অন্যের অজ্ঞাতসারে সেখানে অবতরণ করে (এটাও অসম্ভব নয়) স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলে থাকে তাহলে সেই দ্বীপটি এই নতুন জাতিটিরই অধিকারভুক্ত হবে; কারণ নরওয়ে তার সার্বভৌমত্ব কার্যে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কাজেই ভবিষ্যতে কোন জাতি যদি চন্দ্রপৃষ্ঠে পতাকা নিক্ষেপ করে তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করে তবে বেশ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে। কিন্তু কেউ চন্দ্রে অবতরণ করে তার পতাকা উত্তোলন বা ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রমাণ না দেওয়া দাবী পর্যন্ত আইন সিদ্ধ হবে না। অবশ্য তখনও কিন্তু সব মিটবে না; কারণ ইতিমধ্যে অন্য কোন জাতির কেউ এসে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর বাইরে অবস্থিত কোন জায়গা-জমির জন্যে সম্ভবতঃ অন্য রকমের ব্যবস্থা গৃহীত হবে। হয়তো একথাই সবাই মেনে নেবে যে, এই ধরণের জায়গা-জমি রাষ্ট্রসংঘের রক্ষণাধীনে থাকবে। তখন, যদি কেউ সদুদ্দেশ্য নিয়ে একে ব্যবহার করতে চান, তবে রাষ্ট্রসংঘ তাতে সম্মতি দেবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কেমন করে চাঁদে রকেট পাঠানো যাবে

আজকাল খবরের কাগজের সামনের পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করলে যদি বৈজ্ঞানিক উপন্যাসের সাময়িক পত্রে বিষয়-সূচীর মত মনে হয়, তার সহজ কারণ হলো এই যে, মহাশূন্যের যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। এর ফলে, যেগুলি কয়েক দশক পূর্বে পেশাদার সাময়িক পত্রাদিতে দেখা যেত, এখন সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ বছর পূর্বেও কোন বস্তুকে চন্দ্রে নিক্ষেপের কথা বললে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকাদিতে প্রকাশিত ফলিত গণিতের দৃষ্টান্তগুলির মত মনে হতো। আজকাল লোকে কাগজের শিরোনামগুলি দেখে এজন্যে যে, কেউ একাজ করেছে কিনা।

এটা এখন পর্যন্ত একটা বিচার্য প্রশ্ন যে, চত্বারিংশৎ বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাশিয়ানরা এটা করবার জন্যে চেষ্টা করেছিল কিনা। তারা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাবার কথা দিয়েছিল এবং প্রত্যেকেই একথা ধরে নিয়েছিল যে, তারা ১৯৫৭ সালের ৭ই নভেম্বর চন্দ্রের উপর কোন একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করবে। এই তারিখের কয়েক দিন পূর্বে একথাও জানানো হলো যে, ৭ই নভেম্বর তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবার কথা এবং এই গ্রহণ সাইবেরিয়া থেকে দৃষ্টিগোচর

হবে। তখন একথা মনে করা হয়েছিল যে, তারা সেই তারিখে সংঘর্ষ ঘটাবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু কিছুই দেখা যায়নি। তারা চেষ্টা করেছিল বা করেনি, কি চেষ্টা করেও কৃতকার্য হয়নি—এসব কথা না জানা পর্যন্ত অন্ততঃ একটি কথা বলা যায় যে, চন্দ্রপৃষ্ঠে অস্ত্রক্ষেপণ করা এখন সম্ভব।

কিন্তু কেমন করে চন্দ্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করা সম্ভব হবে? বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সমস্যাটার বিষয় আরম্ভ করা যাক। ধরা যাক, চাঁদের সেই দূরত্ব থেকে কোন একটা বস্তুকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে ফেলে দেওয়া সম্ভব। কত দ্রুতগতিতে চলে এটা সংঘর্ষ ঘটাবে? উত্তর হবে এই যে, এটা সেকেণ্ডে ৩৬,৫০০ ফুট বেগে ছুটে গিয়ে আঘাত করবে, অবশ্য একথা ধরে নিতে হবে যে, বাতাস এর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করবে না। এই সংখ্যাটা খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ চন্দ্রে কোন জিনিস ছুঁড়ে মারতে হলে এই গতিবেগেরই প্রয়োজন হবে। যদি এই দূরত্বটাকে মাইলের হিসেবে প্রকাশ করা হয় তবে সেকেণ্ডে হবে প্রায় ৭ মাইল।

কাজেই রকেটকে চাঁদে গিয়ে পৌঁছতে হলে তাকে সেকেণ্ডে ৩৬,৫০০ ফুট হিসেবে গতিবেগ অর্জন করতে হবে। যখন রকেটটা বায়ুমণ্ডলের উপরে গিয়ে উঠবে—ধরুন ২৫০ মাইল উপরে উঠেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে রকেট এই গতিবেগ অর্জন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই এই উচ্চতায় উঠবে এবং এর জ্বালানী নিঃশেষিত হয়ে যাবে। অবশ্য তখনও সে উপরে উঠতেই থাকবে, কিন্তু সেকেণ্ডে ৩৬,৫০০ ফুট হিসেবে নয়। ২৫০ মাইল উচ্চতায়ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান বেশ শক্তিশালী। এই টান রকেটটাকে সেকেণ্ডে ২৯ ফুট হারে পিছনে টেনে রাখে। এর অর্থ হলো—জ্বালানী ফুরিয়ে যাবার এক সেকেণ্ড পরে রকেট সেকেণ্ডে ৩৬,৪৭১ ফুট হিসেবে ঊর্ধ্বে

আরোহণ করতে থাকবে। আর এক সেকেণ্ড পরে এর গতি হবে সেকেণ্ডে ৩৬,৪৪২ ফুট হিসেবে। তার আরও এক সেকেণ্ড পরে তার উর্ধ্বগতি চলতে থাকবে সেকেণ্ডে মাত্র ৩৬,৪১৩ ফুট হিসেবে। মোটের উপর রকেটের গতিবেগ ক্রমশঃ একটা নিয়মিত হারে কমতে থাকবে। এটা কখনও একরকম থাকে না, এমন কি মাত্র দু-সেকেণ্ডের জন্য চললেও না।

যতই সময় যেতে থাকে পৃথিবী ও রকেটের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ক্রমশঃই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। ৩,০০,০০০ সেকেণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিরাশী ঘণ্টার পর রকেটের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় বার তের ফুটের মত থাকে মাত্র। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে রকেট চন্দ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২৩,৬০০ মাইল দূরে থাকবে। এই সংখ্যাটা পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্বের মোটামুটি ৯।১০ ভাগ। একারণ সংখ্যাটার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

ঐ দূরত্বে পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির যতটা অবশিষ্ট থাকে তার টান আর চন্দ্রের আকর্ষণ—উভয়েই সমান শক্তিশালী। অথবা একথাও বলা যেতে পারে—উভয় শক্তিই সমান দুর্বল, একে অন্যকে অকর্মণ্য করে দেয়। রকেটটি এই সীমারেখার মাত্র কয়েক ফুট এদিকে বা ওদিকে থাকে এবং সেই তফাৎ অনুযায়ী এদিক বা ওদিক জয়লাভ করে। কাজেই রকেটটির যদি এই টানটুকু পেরিয়ে যাবার মত গতিশক্তি তখনও থেকে থাকে তবে সে চন্দ্রের আওতার মধ্যে গিয়ে পড়বে। চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি খুব ক্ষীণ হতে পারে, কিন্তু তার যে টান আছে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। কাজেই রকেটটা চাঁদের দিকেই পড়তে থাকবে। সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী মধ্য লাইন পেরিয়ে প্রায় ৫০,০০০ সেকেণ্ড পর রকেট চন্দ্রের উপর

পড়ে চুরমার হয়ে যাবে। এই সম্পূর্ণ পথটা অতিক্রম করতে রকেটের ৯৭ ঘণ্টা কয়েক মিনিট অথবা ৪ দিন ১ ঘণ্টা এবং কয়েক মিনিট সময় লাগবে।

কিন্তু আপনারা কি পড়েননি যে, রাশিয়ানরা অথবা অন্য কেউ বলেছেন যে, দশ ঘণ্টার মধ্যেই রকেট চাঁদে গিয়ে পৌঁছবে? হ্যাঁ, আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়, কিন্তু সেটা রকেট যোগে চন্দ্রলোকে যাত্রা নয়, সেটা হলো সরলীকৃত অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে যাত্রার কথা মাত্র। এই সংখ্যাটা কেমন করে পাওয়া গিয়েছিল সেটা আমি ঠিকমতই জানি। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল থেকে চন্দ্রের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত দূরত্ব হলো ২,৩৯,০০০ মাইল। আবার কোন সময়ে এই দূরত্ব কমে গিয়ে ২,২১,৪৬৩ মাইলে দাঁড়ায়। আবার কোন সময়ে এই দূরত্ব বেড়ে গিয়ে ২,৫২,৭১০ মাইল হয়ে থাকে। কেউ কেউ কোন সন্দেহ পোষণ না করে উদারতার সঙ্গে বড় সংখ্যাটি নিয়ে তাকে সেকেণ্ডে ৭ মাইল দিয়ে ভাগ করেছে। এই সহজ হিসেবের ফলেই সে ১০ ঘণ্টা সময় পেয়েছে। এবং সহজেই মনে হয়, সে একথা ধারণাই করতে পারেনি যে, এই হিসেবটা করা হয়েছিল খুবই সাধারণ রকমের—কারণ রকেট তার সর্বোচ্চ গতি সমভাবে রক্ষা করে চলতে পারে না।

এখন, এই ব্যাপারের সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি আমাদের জানা হয়ে গেছে, কাজেই আমরা এই প্রশ্নের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি—এটা এখনই করা সম্ভব কিনা? হ্যাঁ, একাজ এখনই করা যেতে পারে এবং এই কাজ করবার দুটি পৃথক পদ্ধতি আছে। একটি হলো যাত্রা সুরু করবার সময় ভূমি থেকে ঊর্ধ্বে তুলে দেবার জন্যে ব্যবস্থা করা। বিশেষ ভাবে তৈরী বড় ক্ষেপণাস্ত্র, যেমন থর—একে প্রথমে উৎক্ষেপক (বুষ্টার) হিসেবে সমগ্র জিনিসটাকে

উপরে তুলে দেবার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। থবের অগ্রভাগে আরও তিনটি রকেট পর পর সজ্জিত থাকবে। পূর্বের যেসব কঠিন জ্বালানীর রকেট রয়েছে সেগুলিকে বিভিন্ন রকমে সাজিয়ে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। থর এবং তার পরবর্তী দুই পর্যায়ের রকেট দুটি পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং উপরের শেষ রকেটটি চাঁদে গিয়ে পৌঁছবে। প্রথম সবচেয়ে বড় রকেটটির কাজ হবে ভূমি থেকে উপরে ওঠবার সময় পর পর সজ্জিত সবগুলি রকেটকে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে উপরে তুলে দেওয়া। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে উপরে তুলে দেবার জন্যে বেলুনের সাহায্যেও নেওয়া যেতে পারে। বেলুন এই পর পর সজ্জিত বিভিন্ন পর্যায়ের রকেটগুলিকে ১,০০,০০০ ফুট উপরে নিয়ে যাবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯৯ ভাগই ১,০০,০০০ ফুটের নীচ পর্যন্ত খুব ঘন; কাজেই প্রথম পর্যায়ের বড় রকেটের দ্বারা যে কাজ হতো, বেলুনের সাহায্যেও প্রায় সেরূপ কাজই হবে।

যাহোক, এই দু-রকমেই চন্দ্রে রকেট উৎক্ষেপণ সম্ভব। কিন্তু কোন রকমেই রকেট দশ ঘন্টায় চাঁদে পৌঁছতে পারবে না।

চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী রকেট

অধ্যাপক হারম্যান ওবার্থ লিখিত "দি রকেট ইন-টু ইণ্টার-প্লানেটারি স্পেস" নামে রকেটতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ১৯২৩ সালে মিউনিকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইখানিতে এই কথাগুলি লিখিত আছে—"পরবর্তী কালে কেউ যদি এমনভাবে রকেট উৎক্ষেপণের চেষ্টা করে যাতে সেটা চাঁদকে পিছনে ফেলে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে এবং তাতে যদি স্বয়ংক্রিয় ফিল্ম ক্যামেরার ব্যবস্থা থাকে,

তাহলে আমরা সেই ছবি থেকে চাঁদের অজানা দিকটার খবর জানতে পারবো।" এই কথাগুলি যখন লেখা হয়েছিল, তার ৩৫ বছর পরে বৈজ্ঞানিকেরা আজ ঠিক সেই কথাই চিন্তা করছেন। এবং যেহেতু তাঁরা মনে করেছেন যে, আগামী বছর পাঁচেকের মধ্যেই এ কাজটা করা সম্ভব হবে, তখন অধ্যাপক ওবার্থ, যিনি এখন আলাবামার হান্টস্‌ভিলে আছেন অবশ্যই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য দেখতে পাবেন। অধ্যাপক ওবার্থ—যে উপায়ের কথা ভেবেছিলেন চাঁদের অজানা পিঠের ছবি তোলবার জন্যে, এখন সম্ভবতঃ তার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক উপায় অবলম্বিত হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে আলোচনা করবার আগে এটা পরিষ্কারভাবে জানা প্রয়োজন—চাঁদের অর্ধাংশ আমাদের কাছে অজানা রয়েছে কেন? পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে একমাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার অক্ষরেখার উপর একবার পাক খেতেও ঐ সময়ই, অর্থাৎ একমাসই লাগে। এ যেন একটি লোক আর একটি লোকের দিকে মুখ করে তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লোকটি কখনও পরিক্রমাকারী লোকটির মাথার পিছন দিকটা দেখতে পাবে না; কারণ পরিক্রমাকারীও তার অক্ষরেখার উপর ঘুরে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এ বিষয়ে পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে অবস্থায় আছেন, অন্যান্য গ্রহ—যেমন, মঙ্গল, বৃহস্পতি বা শনি প্রভৃতির জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেরও অনুরূপ অবস্থাই হবার কথা। আমাদের সৌরজগতের সবগুলি চাঁদ একই রকম ব্যবহার করে—তাদের সবগুলিরই একটা নির্দিষ্ট দিক সর্বদা তাদের গ্রহের দিকে ফিরে থাকে।

কাজেই আমাদের চাঁদের অপর দিকটা দেখতে হলে একটা যানকে চাঁদ ছাড়িয়ে বেশ দূরে মহাকাশে পাঠাতে হবে। অধ্যাপক

ওবার্থ প্রথম যখন 'এই সমস্যাটা নিয়ে ভেবেছিলেন তখন তিনি ধারণা করেছিলেন যে, একটা রকেট উপরে উঠে গিয়ে একটা ফাঁসের মত চাঁদের চারদিক দিয়ে ঘুরে আসবে এবং ঘোরবার মুখে চাঁদের ছবি তুলে নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তারপর সম্পূর্ণ রকেটটা প্যারাস্যুট যোগে ভূমিতে অবতরণ করবে। অথবা ক্যামেরাটা একটা প্যারাস্যুট সমেত রকেট থেকে উৎক্ষিপ্ত হবে।

বৈজ্ঞানিকরা এখন মার্কিন বিমান বাহিনীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে (অবশ্য এটা একটা অনুশীলন চুক্তি মাত্র) এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করছেন। তাঁরা যে এখনই এরূপ রকেট নির্মাণ করতে যাচ্ছেন, তা নয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁরা হয়তো অন্য উপায় অবলম্বন করবেন। এখন আমাদের টেলিভিশন থাকবার ফলে সমস্যাটা আরও অনেক সহজ হয়ে গেছে।

একটা রকেটকে চন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে এমন ভাবে ছুঁড়তে হবে যেন সেটা চন্দ্র-পৃষ্ঠে না পড়ে তার একশ' মাইল বা ঐ রকম কিছুটা দূর দিয়ে যাবার সময় চন্দ্রের আকর্ষণে তার চারিদিকে ঘুরতে থাকবে। ঘূর্ণন পথটা কিন্তু ফাঁসের মত হবে না—পথটা হবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় হাইপারবোলা। এই হাইপারবোলার মত পথে চলতে গিয়ে রকেটটা আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে থাকবে; কিন্তু পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করবার সম্ভাবনা কয়েক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ মাত্র। যাহোক, আমরা রকেটকে ফিরে পাবার জন্যে ব্যগ্র নই, আমরা চাই কেবল ছবিগুলি। এখানেই টেলিভিশন উপস্থিত হয় বিজয়ী রূপে। টেলিভিশনের সাহায্যেই রকেট ছবিগুলি পৃথিবীতে পাঠাতে পারবে।

স্বভাবতঃই এতে কতকগুলি অসুবিধা থাকবে; কিন্তু পরীক্ষাটা

হবে মোটামুটি এরকম ভাবেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এখন ধারণা এই যে, চন্দ্রের অজানা দিকটা, আমাদের পরিচিত দিকের মতই হবে। অনেকে মনে করেন—চন্দ্র-পৃষ্ঠের অজানা দিকটা জানা দিকের চেয়ে অনেকটা মসৃণ। অনেকে আবার এসম্বন্ধে আগাম কোন মতামত প্রকাশ করতে রাজী নন। যাই হোক, এ-সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কারণ বছর দুয়েকের মধ্যেই আমরা এবিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানতে পারবো।

চাঁদে ধুলি-পাত্র

অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি একথা বুঝতে পেরেছি যে, চাঁদ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা বিষয় সাধারণ লোকেরা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। অন্য সব মামুলী খবর—যেমন, চাঁদের আয়তনের পরিমান (২১৬০ মাইল ব্যাস) অথবা তার দূরত্ব (মোটামুটি ২,৪০,০০০ মাইল)—ইত্যাদি বিষয়গুলি কিন্তু নির্বিচারে মেনে নেয়। কিন্তু বক্তা যখন বলেন যে, চাঁদের পিঠে যতটা সূর্যকিরণ পতিত হয় তার শতকরা ৭ ভাগ মাত্র প্রতিফলিত করে—সে কথা শুনে বক্তৃতা শেষ হবার পরে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এসে বলবে যে, সে হয়তো সংখ্যাটা ভুল শুনেছে। অথবা বক্তার মুখ থেকেই হয়তো ভুল সংখ্যাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে।

বক্তাকে বলা হবে যে, আপনি নিশ্চয়ই ভুল করে শতকরা ৭০ এর স্থলে ৭ বলেছেন। বক্তাও তখন বলেন, আমার যতদূর স্মরণ হয়—শতকরা ৭ ভাগের কথাই বলেছি এবং তাই আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল—রাতের আকাশে চাঁদ ঝলমলে রূপালী চেহারা নিয়ে

দেখা দিলেও, তার মধ্যে কালো মত কতকগুলি পাথুরে জায়গা আছে।

শ্রোতা তখন তার এত দিনের দেখা রূপালী চন্দ্রালোকের বিষয়টা এই বিশ্বাসে মেনে নিতে চেষ্টা করে যে, পাথরগুলি নিশ্চয়ই খুব কালো হবে। তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড চিন্তার পরেই হয়তো উল্লাসিত ভাবে বলে উঠবে—ওঃ—আপনি কালো জায়গাগুলির কথা বলছিলেন! তার উত্তর হবে—৭ শতাংশ সংখ্যাটা সমগ্র চন্দ্র-পৃষ্ঠের পক্ষে প্রযোজ্য; যদি খালি কালো জায়গাগুলির কথাই ধরা হতো তবে আরও অন্ধকার দেখাতো।

চাঁদের এই অন্ধকার জায়গাগুলি মানুষকে চিরকালেই বিভ্রান্ত করে এসেছে। অনেক দেশেই রূপকথায়, গল্পে এই কালো দাগ-গুলিকে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কেউ সেগুলিকে বলেছে খরগোস, কেউ বলেছে একটা বুড়ী আগুন জ্বালাবার কাঠ নিয়ে যাচ্ছে অথবা একটা লোক কিছু করছে বা করছে না। আর খরগোস বা বুড়ী বা অন্য কেউ চাঁদে গিয়েছিল কেন—সে বিষয়েও গল্প তৈরী করা হয়েছিল। এমন কি, টেলিস্কোপ উদ্ভাবনের পূর্বেও দার্শনিকরা এই মত ব্যক্ত করতেন যে, এই কালো জায়াগাগুলি যে কোন কারণে হোক, চন্দ্র-পৃষ্ঠের অপর জায়গা থেকে স্বতন্ত্র ধরণের।

সর্বপ্রথম টেলিস্কোপ নির্মিত হবার পর তখনকার দিনের জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা প্রচলিত রূপকথা ও দার্শনিক মতামত বিচার করে বললেন যে, অন্ধকার অঞ্চলগুলি সত্যসত্যই অন্য জায়গা থেকে ভিন্ন রকমের; কারণ এই উজ্জ্বল জায়গাগুলি হলো চাঁদের সমুদ্র অথবা মহাসমুদ্র। কাজেই সেই জায়গাগুলির Mare Imbrium অর্থাৎ 'বৃষ্টির সমুদ্র'—ইত্যাদি ল্যাটিন নাম দেওয়া হলো এবং সমগ্রভাবে সেগুলিকে Maria বলেই ধরা হয়েছিল। যদিও চাঁদে সত্যিকার সমুদ্রের অস্তিত্বের

এই ধারণা এক-শ বছরের বেশী স্থায়ী হয় নি, তথাপি ওই নামগুলি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

যখন জানা গেল, প্রকৃত সমুদ্র নয় তখন প্রশ্ন উঠলো—তাহলে সেগুলি কি? আজও পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে তার জবাব পাওয়া যায় নি। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে মাত্র দুটি জিনিষ নজরে পড়ে। মেরিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রগুলি সম্পূর্ণ অন্ধকার; আর সেগুলির উপরিভাগ অবিশ্বাস্য রকম সমান এবং মসৃণ। অবশ্য এই বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চলের প্রত্যেকটিতেই দু-একটি আগ্নেয়গিরির মুখ এবং কোথাও বা পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ সেগুলি সমুদ্র-পৃষ্ঠের মত সমতল।

তাদের এই অবস্থার কারণ সম্বন্ধে মামুলি জবাব হলো এই যে, এগুলি যতদিনের পুরনো ততদিন ধরেই অজস্র গলিত লাভা উদ্গীরণ করেছে এবং সেগুলি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার পর জমে গিয়ে এই বিশাল কঠিন লাভাস্তরের সৃষ্টি হয়েছে। কোন জবাব না পাওয়ার চেয়ে এটা তবু অনেকটা ভাল। কিন্তু মেরিয়ার সমতল ভূমিগুলি জমাট-বাঁধা লাভার চেয়েও অনেক বেশী মসৃণ দেখায়। ইংরাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টমাস গোল্ড সম্প্রতি ঠিক এরকমের কথাই বলেছেন। এবং তিনি তাঁর একটি নতুন ধারণার কথা বলেছেন যে, এগুলি ধূলিকণাপূর্ণ বিশাল আধারের মত কিছু হতে পারে, অর্থাৎ অবনমিত স্থানগুলি কানায় কানায় সূক্ষ্ম ধূলিকণায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। এই ধূলিকণার স্তর হয়তো মাইল খানেকের মত পুরু হতে পারে।

চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ যে ধূলিকণায় ভর্তি—একথা কিছু কাল যাবৎ স্বীকৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন আকারের উল্কা অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকৃতির—নিশ্চয়ই চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে অনবরত আঘাত করছে। এই আঘাতের ফলে সেগুলি নিজেরাও চূর্ণিত হয় এবং চন্দ্রের প্রস্তরখণ্ড-

গুলিকেও চূর্ণ করে ধূলিকণায় পরিণত করে। এমন কি, মহাজাগতিক রশ্মিও এ-বিষয়ে কম যায় না—এই রশ্মি প্রস্তর খণ্ডগুলির স্ফটিকাকৃতির গঠন চূর্ণ করে সেগুলিকে ধূলিকণায় পরিণত করে, কিন্তু এর একটা স্বয়ং-ব্যবস্থিত সীমা আছে। কারণ ধূলিকণা একবার গঠিত হলে তারাই আবার নীচের পাথরগুলিকে রক্ষা করবে। চাঁদের পৃষ্ঠদেশে সর্বত্র ধূলিকণায় আবৃত এবং সেই ধূলিকণার স্তর স্থানে স্থানে আধ ইঞ্চি থেকে প্রায় ৮ ইঞ্চি পুরু হতে পারে—সব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই যখন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত, তখন টমাস গোল্ডের এক মাইল পুরু ধূলিকণায় পূর্ণ আধারের মতবাদ সাধারণতঃ খুবই অভিনব বোধ হবে। যাহোক, এটা অসম্ভব নয় এবং মেরিয়ার অধিকাংশ স্থানকেই এত মসৃণ দেখায় যে, এই ব্যাখ্যা খুব অসঙ্গত মনে হয় না।

গোল্ডের কথা ঠিক, কি অঠিক, তা বোধহয় টেলিস্কোপও আমাদের জানিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের এমণ গবেষণার প্রণালী আয়ত্তে আসবে, যাতে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হবে।

চাঁদের উপর সেতু

বিগত তিন বছরে বিভিন্ন রকমের জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগতভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার ফলে বিশেষ বিব্রত হয়েছিলেন। প্রশ্নগুলি ছিল এই রকম—চন্দ্র-পৃষ্ঠে যে একটা সেতু আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জনসাধারণকে আরও বিশদভাবে জানান নি কেন?

অথবা চন্দ্রের Mare Grisium-এর উপরে যে সেতুটা আছে, সে সম্বন্ধে তথ্যাদি গোপন রাখা হয়েছে কেন?

অন্য কথায় বলা যেতে পারে—এরূপ কোন জিনিষের অস্তিত্বই নেই—যদিও কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজে "Bridge across the Mare Grisium" খবরটি বেরিয়েছিল।

এই কাহিনী সুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে, যখন নিউইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক পরলোকগত জন জে. ও'নিল—যিনি সখ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাদি করতেন—চন্দ্র-পৃষ্ঠের মানচিত্রে যে জায়গাটা Mare Grisium নামে চিহ্নিত ছিল, চন্দ্রের সেই জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই Mare Grisium তিন-শ' মাইলেরও কিছু বেশী ব্যাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা বৃত্তাকার অঞ্চল। এই কালো অঞ্চলটা যে শুধু খালি চোখেই দেখা যায় তাই নয়, ক্রমবর্ধমান চন্দ্রকলায় এটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অন্ধকার অঞ্চলের পূর্বদিকের সীমার মধ্যস্থলে ও'নিল এমন একটা জিনিষ লক্ষ্য করেন, যাতে তার মনে হয়—অস্তগামী সূর্য যেন একটা স্বাভাবিক সেতুর ভিতর দিয়ে রশ্মি বিকিরণ করছে। এস্থলে এ-বিষয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। Mare Grisium-এর মসৃণ সমতলের প্রান্তভাগের ঐ স্থানটিতে মধ্যস্থল ভাঙ্গা একটা উচু পর্বত-প্রাকার আছে। সে জন্যে মনে হতো—দুটা পর্বত যেন ঐ ভগ্নস্থানের দু-দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে খুব কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। প্রায় এক-শ' বছর পূর্বে চন্দ্রের মানচিত্রে এই পর্বত দুটিকে 'প্রোমোন-টোরিয়াম ওলিভিয়াম' এবং 'প্রোমোনটোরিয়াম ল্যাভিনিয়াম' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তথাকথিত এই দুটি প্রোমোনটোরির ঠিক

পশ্চিমে Mare Grisium-এর সমতল অঞ্চল কিছুটা উঁচু হয়ে গেছে। সূর্য যখন এই অঞ্চলের উপর দিয়ে অস্তগমন করছিল ও'নিল তখন প্রোমোনটরির পশ্চিমদিকে পাখার মত ছড়ানো একটা আলোর পর্দা দেখতে পান। এই আলোর পর্দাটাকে সেতুর খিলানের ভিতর দিয়ে আসা অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির মত মনে হয়েছিল।

এটা কেবল বিস্ময়কর আবিষ্কারই নয়, বড় রকমের একটা রহস্যও বটে! পৃথিবীতে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাকৃতিক সেতু আছে এবং কেমন করে সেগুলির সৃষ্টি হতে পারে, সেকথাও আমাদের জানা আছে। নদীর স্রোত সঙ্কীর্ণ পর্বত প্রাকারে বাধা পেলে ধীরে ধীরে সেখানে গর্তের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে সেই প্রাকারের উপরের দিকটা ঠিক সেতুর আকার ধারণ করে। অথবা মরুভূমির পরিবেশে বায়ু-তাড়িত ধূলিকণার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অনেক সময় সঙ্কীর্ণ গিরি প্রাকারের স্থান বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এরূপ প্রাকৃতিক সেতু সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু চাঁদে জল অথবা বাতাস বলতে কিছু নেই যার দ্বারা ধূলিকণা পরিবাহিত হয়ে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই চাঁদে যদি এরূপ কোন প্রাকৃতিক সেতু আবিষ্কৃত হয়েই থাকে তাহলে অবশ্য সেটা স্বীকার করতেই হবে; কিন্তু কেমন করে তার উৎপত্তি হয়েছে, সেকথা বলা সম্ভব নয়।

কেউ কেউ এ-সম্বন্ধে বলেছেন যে, এরকম সেতু কৃত্রিম উপায়েও উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে। কারণ পূর্বেকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেউ তখন এই জিনিসটাকে দেখতে পাননি। এর ফলে একথাও বলা হয়েছে যে, এটা সাম্প্রতিক কালে প্রাণবন্ত শরীরী কর্তৃকই নির্মিত হয়েছে। এবং এই কাহিনীকে আরও চিত্তাকর্ষক করবার উদ্দেশ্যে এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করা হয়েছে। একথাও বলা

হয়েছে যে, এই সেতুটা Mare Grisium-এর এক পাড় থেকে আর এক পাড় পর্যন্ত ৩০০ মাইল ব্যবধানের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে এবং খিলানের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি বিকিরণের কথায় প্রমাণিত হয় যে, সেতুটি কড়ি-বরগার কাঠোমোর সাহায্যে তৈরী হয়েছে।

এ সব অবাস্তব কাহিনীর কথা বাদ দিলেও আর একটা বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, কয়েকজন বৃটিশ পর্যবেক্ষণকারীও সেই দুটি প্রোমোনটোরির পশ্চিমদিকে সমতল অঞ্চলে পাখার মত ছড়ানো আলো দেখতে পেয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আকাশচারী কয়েকটি বস্তুপিণ্ডের মধ্যে চাঁদ হলো এমন একটি বস্তুপিণ্ড, যার ফটো বেশ ভালোভাবেই তোলা যায় এবং সেই সন্দেহজনক স্থানটির এক সেট ফটোও তোলা হয়। সূর্য যখন প্রোমোনটোরির উপরে প্রায় খাড়াভাবে ছিল, তখন কতকগুলি ছবি তোলা হয়েছিল। এতে উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিষ্কার দেখা যায়, এবং পরবর্তী সময়ে তোলা ছবিতে পাখার মত আলোর ফালিও সুস্পষ্ট। যাঁরা টেলিস্কোপের সাহায্যে এ অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তাঁদের কাছে সে সময়ে কি ব্যাপার ঘটেছিল, এই ফটোগ্রাফগুলির তুলনা-মূলক বিচার করলেই তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। সূর্য যখন Mare Grisium-এর পূবদিকের প্রান্তসীমার ঠিক নীচে নেমে যায় তখন প্রোমোনটোরি দুটি এমন ভাবে আলোকিত হয় যে, তাদের উভয়ের মধ্যের সেই ভগ্নস্থান বা ব্যবধানটুকু তখন মোটেই দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিমদিকের সমতল অঞ্চল খানিকটা উঁচু বলে সূর্যরশ্মি সেই ব্যবধান স্থলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ত্রিকোণাকার একটা আলোর পর্দার সৃষ্টি করে। চন্দ্র-পৃষ্ঠে তথাকথিত সেতু বেশ সহজ চিত্তাকর্ষক একটি চোখের ভুল মাত্র।

পৃথিবীর কি দ্বিতীয় আর একটি চাঁদ আছে?

১৯৫০ সাল থেকেই যদিও এটা নিশ্চিত ছিল যে, একদিন কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত হবেই, কিন্তু কার দ্বারা কখন এ কাজ সাধিত হবে তা পূর্ব থেকে বলা আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল তথাপি অনুসন্ধান করবার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এর ফলেই নতুন সমস্যার উদ্ভব হলো এই যে, কোন কক্ষপথে যদি খুব ছোট্ট অজানা কোন স্বাভাবিক উপগ্রহ থেকে থাকে তাহলে কি হবে? অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি এরকমের কোন উপগ্রহের সন্ধান মিলে যায়, তাহলে সেটাকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলেও তো ভুল করতে পারি?

প্রায় দু-বছর পূর্বে যখন জানা গেল যে, প্লুটোর আবিষ্কর্তা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইভ টম্বাগ পৃথিবীর দ্বিতীয় একটি উপগ্রহের সন্ধান করেছেন, তখনই খুব দ্রুত নানা রকম জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়ে গেল। তার মধ্যে বহুল প্রচারিত একটা হলো—মানুষ বোধহয় এমন একটা রকেটে-যান তৈরী করবার চেষ্টায় প্রায় প্রস্তুত হয়ে আছি, যেটি মহাশূন্যের কয়েকশত মাইল উর্ধ্বে মানুষ বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। তখন যাত্রীবাহী আকাশ-ষ্টেসন নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। পরিষ্কারই বুঝা যায়, ক্লাইভ টম্বাগ মহাকাশের কোথাও ছোট্ট একটি চন্দ্র (উপগ্রহ) আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, যেখানে একটা আকাশ-ষ্টেসন তৈরী করা যেতে পারে।

এর স্বপক্ষে যুক্তিটি এতই চমৎকার ছিল যে, সেটা যে ভুল, সেকথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলবার সময় আমিও খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। একদিন খবর পাওয়া গেল যে, টম্বগ পৃথিবী থেকে

৪০০ মাইল এবং ৬০০ মাইল দূরে ছোট্ট দুটি চাঁদ আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে ব্যাপারটা আরও কিছুটা জটিল হয়ে উঠলো। কিন্তু খবরটা মিথ্যা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়—আজকালের দিনে এরকমের একটা গুজবের উৎপত্তি কোথা থেকে হলো, একটা বিস্ময়ের কথা। আমি যখন ক্লাইভ টম্বগকে এ-বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি বলেছিলেন—'অতিরিক্ত দুটা চন্দ্র আবিষ্কার তো দূরের কথা, আমি এখন পর্যন্ত আকাশের ৬০০ মাইল, এমন কি, ৪০০ মাইল অবধিও অনুসন্ধান করে দেখিনি।' এই হলো আর একটা বিষয় যার সম্পর্কে পুনরুল্লেখ করাও বেদনাদায়ক, কারণ ব্যাপারটি ছিল এমনই চক্রান্তমূলক।

এই বিষয়ে আলোচনা করবার সময় আমি বুঝতে পারলাম যে, অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও পৃথিবীর দ্বিতীয় একটি উপগ্রহ সম্বন্ধে পক্ষপাত-মূলক ধারণা আছে। অনেকেই হয়তো একথা বুঝতে পারেন না, কিন্তু যার ফলে তাঁদের মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, সেটা হচ্ছে একটা কাহিনী, যা তাঁরা তরুণ বয়সে পড়েছিলেন। সেটা এখন আর তেমন বিখ্যাত নয়, যেমন এক সময়ে ছিল; কিন্তু তার প্রভাব এখনও কিছুটা রয়েছে। আমি জুল ভার্নের 'Around the Moon' নামক গল্পের কথা বলছি, যেটা ১৮৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং বহু বছর ধরে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়ে আসছে।

সেই গল্পের—যদি আপনি বইখানা পড়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই স্মরণ হবে—প্রকাণ্ড অ্যালুমিনিয়ামের খোলটা তিনজন অভিযাত্রীসহ ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চন্দ্রলোকে যাবার পথে পাশ কেটে-যাওয়া বিরাট একটা বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটবার উপক্রম হয়েছিল। জুল ভার্নে তাঁর গল্পের নায়কদের একজনের মুখ দিয়ে পাঠকদের

নিকট ব্যাখ্যাচ্ছলে বলেছেন "সেটা সামান্য একটা উল্কাপিণ্ড—কিন্তু বিশাল আকৃতির। পৃথিবীর আকর্ষণে আটকা পড়ে আকাশ-পথে উপগ্রহরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" এমন কি, জুল ভার্নে একথাও বলেছিলেন যে, তিনি পেটিট নামে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ থেকেই এই ধারণা পেয়েছিলেন। একথা সত্য যে, ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলোনের পেটিট এই নিবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন, ৪৬৫০ মাইল দূরে পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী আমাদের দ্বিতীয় একটি উপগ্রহ আছে। কিন্তু জুল ভার্নে যদি তাঁর এই ধারণার বিষয়টা তার গল্পের অন্তর্ভুক্ত না করতেন তাহলে আজ তাঁর নিবন্ধের কথা কেউ স্মরণ করতো না।

এই দ্বিতীয় চন্দ্রটা কত বড় হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, সে কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে কারো কারো ধারণা যে, এর পাশাপাশি মাপ কম পক্ষে এক-শ' গজের মত হবে। যদি তা-ই হতো তা হলে সেটা কখনও অনাবিষ্কৃত থাকতো না- এমন কি, পেটিটের সময়ও না; কারণ একে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ব্যতিরেকে খালি চোখেই ধীর গতিতে ভ্রাম্যমান বেশ উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের মত দেখা যেত। কয়েকজন সখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জুল ভার্নের গল্প পড়বার পর সত্য সত্যই দ্বিতীয় চন্দ্রটি খুঁজে বের করবার জন্যে গোপনে গোপনে চেষ্টা করেছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁদের একজনও—যার মধ্যে পেটিট নিজেও ছিলেন—উপগ্রহটি কতটা ছোট হলে দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন উৎসাহী লোকদের সাহায্যে তা পরীক্ষা করে দেখবার কাজে রত হন নি। যদি তারা ঠিক সন্ধান করতে পারতেন তবে নিজেরাই দেখে অবাক হয়ে যেতেন যে, পৃথিবী

থেকে ১,০০,০০০ মাইল দূরে ঠিক এক মাইল ব্যাসের দ্বিতীয় একটা চন্দ্র এখনও খালি চোখে দেখা যাবে। এটা একটা অনুজ্জ্বল তারার মত দেখাবে; কিন্তু এক ঘণ্টা বা ওই রকম কিছু একটা সময়ের পর দেখা যাবে—সেটা নিকটবর্তী তারকাদের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে গেছে। মোটের উপর এটা হয়তো ব্যাবিলোনিয়ানদের দ্বারা (যদি তারও আগে না হয়ে থাকে) আবিষ্কৃত হয়েছিল।

পৃথিবীর দ্বিতীয় চন্দ্রের জন্যে সাম্প্রতিক অনুসন্ধান আরম্ভ হবার আগেই এসব কথা কম-বেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জানা ছিল।

তাঁরা জানতেন—কয়েক শত ফুট ব্যাসের কোন কিছুর আশা করা দূরে থাক, কয়েক মাইল ব্যাসের কোন কিছুর আশাও করতে পারেন না। ফটোগ্রাফিক টেলিস্কোপের সাহায্যে বর্তমানে এবিষয়ে অনুসন্ধানের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। যদিও যন্ত্রটা ট্রাকের উপর বসাবার পক্ষে খুবই ছোট তথাপি এর শক্তি অসাধারণ বলেই মনে হবে। এই যন্ত্রটি ১০০০ মাইল দূরে থেকে পৃথিবীর চতুর্দিকে বিচরণকারী একটা টেনিস বলের ছবি অনায়াসে তুলতে পারে। এমন কি, চন্দ্রের দূরত্ব থেকে, অর্থাৎ ২,৪০,০০০ মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছানো ৪৬ ফুট লম্বা একটা ভি-টু রকেটের ছবি তুলতেও অসুবিধা হয় না।

ক্লাইড টম্বগের অনুসন্ধানের ফলেও কোন কাজ হলো না। পৃথিবীর এমন কোন স্বাভাবিক ক্ষুদ্রাকার উপগ্রহ নেই, যদি এই নামটা এমন কোন জিনিষের জন্যে ব্যবহার করি, যেটা ভূমিতে থাকবার সময় অতি সামান্য বল প্রয়োগেই উপরে তোলা যেতে পারে। অথবা স্বাভাবিক ক্ষুদ্র চাঁদ থেকে উৎক্ষিপ্ত বিভিন্ন আকৃতির ক্ষুদ্রকায় কৃত্রিম উপগ্রহের পথের সন্ধানও মিললো না।

এ সত্ত্বেও অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর চতুর্দিকের কক্ষপথে

থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি ছোট ছোট পাথরের টুক্‌রার চেয়ে বেশী বড় হবে না।

আকাশে ভুতুড়ে আলো

আপনার দৃষ্টিশক্তি যদি ভাল থেকে থাকে এবং আপনি যদি সহরের আলো থেকে বেশ দূরে বাস করেন তবে গ্রীষ্মের শেষের দিকে আকাশে একটা জিনিষ দেখবার জন্যে চেষ্টা করতে পারেন, যা অল্প কয়েক জন লোকের পক্ষেই দেখা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীই কখনও এটা দেখেন নি। জিনিষটা হলো—খুব ক্ষীণ, নির্দিষ্ট আকৃতিশূন্য ভুতুড়ে আলোর মত এক ফালি আলো। একজন জার্মান সর্বপ্রথম এই আলো আবিষ্কার করেছিলেন বলে এর জার্মান নাম হয়েছে—Gegenschein; বাংলায় একে 'প্রতিপ্রভা' বলা যেতে পারে। আলোটা এতই ক্ষীণ যে, চন্দ্র যখন উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে তখন একে দেখাই যায় না। ছায়াপথের আলোর চেয়েও এই আলো ক্ষীণতর; কাজেই ছায়াপথ যখন এর অবস্থান স্থল জুড়ে থাকে—যেমন, প্রত্যেক শীতের সময় ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারীর বেশীর ভাগ এবং প্রত্যেক গ্রীষ্মে জুন থেকে জুলাইয়ের অধিকাংশ সময়—তখন একে মোটেই দেখা যায় না।

এই আলোটাকে Counter glow বা প্রতিপ্রভা বলবার কারণ এই যে, আলোর ফালিটা সূর্যের ঠিক সোজাসুজি বিপরীত দিকের আকাশে দেখা যায়। মধ্যরাতে সূর্য যখন সোজাসুজি নীচে থাকে, এই আলোর ফালিটা তখন ঠিক মাথার উপরে থাকবে—অবশ্য এই ব্যাপারটা গ্রীষ্মগুলেই দেখা সম্ভব। এটাকে আমাদের দেশে

ঠিক মাথার উপরে দেখতে পাই না বটে, তখনও কিন্তু ঠিক সেই জায়গাতেই থাকে।

খুব ক্ষীণ বলে এই আলোটাকে এক শতাব্দীর বেশী পূর্বে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী থিওডোর ব্রোরসন ১৮৫৩ সালের এক অন্ধকার রাতে খুব সম্ভব আকস্মিক ভাবেই এই জিনিষটাকে দেখতে পেয়েছিলেন। কেবল ব্রোরসন নন, নিশ্চয়ই আরও অনেকে এটাকে লক্ষ্য করেছিলেন। যদিও অন্যান্য লোকেরা আকস্মিক ভাবেই এই আলোটাকে দেখে থাকেন, তাহলে তারা হয়তো ভাস্বর মেঘের মতই একটা কিছু মনে করেছিলেন, কাজেই এবিষয়ে কেউ একটা কথাও বলেন নি। দু-বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করবার পর ব্রোরসন এ-সম্বন্ধে একটা বিবরণী প্রকাশ করেন।

কিন্তু বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টি, ডবলিউ, ব্যাকহাউস ব্রোর-সনের প্রকাশিত বিবরণী দেখেন নি; কারণ ১৮৭৫ সালে তিনি রয়েল সোসাইটিতে বলেন—সূর্যের অবস্থানের বিপরীত দিকের আকাশে তিনি একফালি আলো দেখেছেন যার বিষয়ে এ-পর্যন্ত আর কেউ কোন বিবরণ প্রকাশ করেননি।

আট বছর পরে এই আলোটা আবার আবিষ্কৃত হয়—এবারের আবিষ্কারক হলেন এডওয়ার্ড এমারসন বারনার্ড নামে একজন আমেরিকান। কেউ যেমন একথা বলতে পারেন যে, ব্রোরসনের বিবরণীর বিষয় ব্যাকহাউসের জানা উচিত ছিল,—তখন ব্যাকহাউসের বিবরণ না জানার জন্যে বার্ণার্ডের উপরও দোষারোপ করতে পারেন না। বার্ণার্ড পরে একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু আকাশের প্রতিপ্রভা আবিষ্কার করবার সময় তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন ফটোগ্রাফার,

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত ছবি তুলতেই ব্যস্ত থাকতেন এবং ধূমকেতু দেখবার আশায় আকাশের দিকে তাকাতেন। বার্ণার্ড এই আলোটাকে খুব উঁচুতে অবস্থিত তারার আলোয় আলোকিত পাতলা একখণ্ড মেঘ বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু পরের দিন রাত্রিতেও তিনি সেটাকে দেখেন। কিন্তু কোন একখণ্ড মেঘের পক্ষে ২৪ ঘণ্টা একই স্থানে থাকা সম্ভব নয় ভেবে তিনি স্থির করেন যে জিনিষটা বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে কিছু একটা হবে।

বার্ণার্ড পরে যা ভেবেছিলেন, তাই হচ্ছে এর একমাত্র ব্যাখ্যা। গাণিতিক উপায়ে এটা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, কোন একটা কিছু সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করলে যদি সেটা পৃথিবীর অপেক্ষা সূর্য থেকে ৯,০০,০০০ মাইল দূরে থাকে, তবে পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করবে। বার্ণার্ড বলেছেন যে, এই ভুতুড়ে আলো সম্ভবতঃ মহাজাগতিক ধূলিকণার মেঘ, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে।

কয়েক বছর পূর্বে কোন একব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে ছবি তোলবার বিশেষ একরকম ক্যামেরার সাহায্যে এই প্রতিপ্রভার ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা চোখে দেখা যায় ফটোগ্রাফের প্লেটেও ঠিক তাই উঠেছিল। কিন্তু আমরা জানি ফটোগ্রাফিক প্লেট কখনও চক্ষুরোগে ভোগে না। কাজেই এর অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

উল্কাপাত

যদি এমন কোন লোক থাকেন যিনি উল্কাপাত দেখেন নি, তবে সেটা তাঁর নিজেরই ত্রুটি। কেউ যদি এক বা একাধিক

উল্কাপাত দেখতে চান তাহলে তাকে সহরের আলো থেকে বেশ কিছু দূরে গিয়ে রাত্রির পরিষ্কার আকাশের দিকে ধৈর্য ধরে নজর রাখতে হবে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—যে কোন দিকে তাকালেই চলবে। যদি ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন তবে একটা না একটা উল্কাপাত নজরে পড়বেই।

যখন এরূপ কোন একটা উল্কাপাত দেখা যায় তখন একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে—এটা ৫০/৬০ মাইল উপর থেকে এসেছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সেটা খুবই বিরল। একথা জানা আছে, কতখানি উচ্চতায় সাধারণতঃ উল্কাগুলি জ্বলে উঠে তাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে; কাজেই তাদের আয়তন কিরূপ হবে, সেটা হিসেব করে বার করা সম্ভব। সাধারণ লোকেরা প্রথমে মাপের হিসেবটা শুনে বিস্মিত হয়ে যাবে যে, সেগুলি এত ক্ষুদ্র! ধরা যাক্‌, যে তারাটিকে আপনি ছুটে আসতে দেখেছেন, সেটি খুব উজ্জ্বল ছিল এবং সন্ধ্যাতারার মত চমৎকার দেখাচ্ছিল। যদি তাই হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে যে উল্কাপিণ্ডটি আকাশে আলোর রেখা অঙ্কিত করতো সেটির ব্যাস হবে প্রায় আধ ইঞ্চি এবং ওজনে প্রায় এক আউন্সের সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র।

আপনি যে উল্কাপিণ্ডটিকে ছুটে আসতে দেখেছেন সেটির আলো-রেখা যদি উজ্জ্বল তারার মত জ্বলজ্বলে দেখা গিয়ে থাকে, তাহলে সেই ছোট্ট পাথরটির, যেটি মহাশূন্য থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছিল, পরিমাপ ছিল এক ইঞ্চির চতুর্থাংশেরও কম। আর ওজনের কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, এদের ৭৫ বা ৮০টি একত্রিত করলে এক আউন্স ওজন হতে পারে। কোন উল্কার আলো যদি খুব ক্ষীণ দেখায় এবং ভাল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোক যদি কোনরকমে তাকে দেখতে পায় তাহলে তার ব্যাস হবে—

একটা দশ নয়া পয়সা যতটা পুরু তার চেয়েও কম এবং তাদের হাজার কয়েকের একত্রে এক আউন্স ওজন হতে পারে।

অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে যখন আপনি বড় রকমের উল্কাপাত দেখতে পাবেন, সেটা উপর দিয়ে যাবার সময় চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলবে। এখন, এরকমের যে উল্কা আশেপাশের যাবতীয় দৃশ্যবস্তুকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে, তাদের কয়েক পাউণ্ড থেকে কয়েক টন ওজন হতে পারে। লক্ষ্য করবার বিষয় হলো এই যে, এক পাউণ্ড ওজনের একটা উল্কাও তীব্র আলোর ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করতে পারে। এতেই বুঝতে পারা যায়, অত্যুজ্জ্বল উল্কাগুলি যথেষ্ট বড় হয়ে থাকে এবং পরে তাদের অবশিষ্টাংশও কিছু দেখতে পাওয়া যায়। তাদের অধিকাংশই মাটিতে পড়বার আগে বাষ্পীভূত হয়ে যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেমন সহজেই মহাশূন্যের এসব আগন্তুকদের ওজন, আয়তন নির্ধারণ করতে পারেন, কিন্তু এরা কোথা থেকে আসে এ প্রশ্নের জবাব অনেক দিন পর্যন্ত তাঁরা তত সহজে দিতে পারেন নি। অনেক কাল পর্যন্ত এর একটা চিরাচরিত জবাব ছিল এই যে, গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি হবার পর মহাশূন্যে যেসব বস্তু উদ্বৃত্ত ছিল সম্ভবতঃ সেসব বস্তুই উল্কারূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ রবার্টসন কিছু তত্ত্বীয় গবেষণার বিষয় নিয়ে উপস্থিত হন, পরে যেগুলি "পয়েন্টিং-রবার্টসন এফেক্ট" নামে পরিচিত হয়। মহাশূন্যে যদি কতকগুলি উল্কাপিণ্ড অন্যান্য বস্তুর মত সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান অবস্থায় থেকে থাকে, তাহলে সূর্য তাদের একাংশকে, অর্থাৎ যেদিকে সূর্যকিরণ পড়বে, কেবলমাত্র সেদিকটাকে উত্তপ্ত করবে। উত্তপ্ত হওয়ার দরুণ সেই অংশটা আয়তনে কিছুটা বেড়ে যাবে এবং এর ফলে তার ভারকেন্দ্রও

কিছুটা সরে যাবে। এই সব কিছু মিলিয়ে যা ফল দাঁড়াবে তাতে উল্কাপিণ্ডটা নিয়মিত ভাবে একটু একটু করে সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকবে এবং সর্বশেষে তার মধ্যে পতিত হবে।

রবার্টসন একটি ফর্মুলাও উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে অনায়াসে হিসেব করে বলা যায় এরূপ ব্যাপার ঘটতে কতটা সময় লাগতে পারে। এর সঙ্গে কেবলমাত্র তিনটি বিষয় (ফ্যাক্টর) জড়িত—উল্কাপিণ্ডটার ব্যাস, তার ভর এবং সূর্য থেকে তার দূরত্ব। রবার্টসনের ফর্মুলা গ্রহাদির সম্বন্ধে (যেমন ধরুন পৃথিবী) প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া যায় তাতে অসীম (ইনফিনিটি) থেকে ক্বচিৎ পার্থক্য প্রকাশ পায়, সাধারণ প্রস্তরে গঠিত আধ ইঞ্চি ব্যাসের একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে যাত্রা করে প্রায় ২৫ মিলিয়ন (একমিলিয়ন—দশ লক্ষ) বছর পরে সূর্যে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। যেহেতু ২৫ মিলিয়ন বছর সৌর জগতের ইতিহাসের তুলনায় অতি কম সময় মাত্র, সেহেতু এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কেবলমাত্র বৃহদাকৃতির উল্কাপিণ্ড-গুলিই, যাদের ব্যাস অন্ততঃ কয়েক ফুট—তাদের কিছুটা অংশ অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকটি রাতের পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির উল্কাপিণ্ড স্খলিত হতে দেখা যায়।

সব সময়েই নতুন উল্কার সরবরাহ দরকার। একবার যখন নতুন সরবরাহের কথা উঠেছিল, তখন কোথায় এগুলির উৎপত্তি হয়—সেকথা অনুমান করাও শক্ত ছিল না। বৃহস্পতি এবং মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের মধ্যস্থলে গ্রাহাণুপুঞ্জের একটা বেষ্টনী আছে—যেখানে কোন গ্রহ গঠিত হয়নি—সম্ভবতঃ বৃহস্পতির প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তিই সংগঠনে বাধা সৃষ্টি করেছে। যতদূর জানা যায় তাতে এখানে ১৩০০ এরও বেশী গ্রহাণু রয়েছে। তাছাড়া আরও হাজার

হাজার কত যে আছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব; কারণ সেগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, পৃথিবী থেকে লক্ষ্য করা যায় না। এটা নিশ্চিত যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ নিত্যকার ঘটনা। এ রকম সংঘর্ষের ফলে টুক্‌রা বা খণ্ডিতাংশ ছিট্‌কে পড়ে নতুন সরবরাহের সৃষ্টি করে। এগুলি ক্রমশঃ সৌর জগতের অভ্যন্তরের দিকে চলতে থাকে এবং পৃথিবী মধ্যপথে বাধা সৃষ্টি না করলে সর্বশেষে সূর্যের মধ্যে পতিত হয়। পৃথিবী যখন এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তখনই আমরা রাত্রির আকাশে উল্কাপাত দেখতে পাই।

উল্কাপিণ্ড থেকে বিপদ

আপনার ইনসিওরেন্স এজেন্টের প্রতিনিধিকে যদি বলেন যে, আপনি উল্কাপিণ্ডের দ্বারা আহত হওয়ার বিরুদ্ধে ইনসিওর করতে চান, তাহলে তার উত্তরে তিনি হয়তো আপনার দিকে কেবল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন! কিন্তু সর্বশেষে আপনি বেশ ন্যায় সঙ্গত হারেই ইনসিওর করতে পাবেন। আমি অবশ্য নিজে এ-রকমের ইনসিওরেন্স চেয়ে পরীক্ষা করি নি, কিন্তু আশাকরি যে প্রত্যেক ২৫,০০০ ডলারের জন্যে এক ডলার প্রিমিয়ামের হারে এ রকমের ইনসিওর করা যাবে। তাছাড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীও এতে ঠিক কাজই করবেন, যেহেতু উল্কাপিণ্ডের দ্বারা আহত হবার সম্ভাবনা এতই কম যে, তাকে উপেক্ষা করাই চলে।

তবুও, এ রকম ব্যাপার ঘটেছে।

১৯৫৪ সালের ৩০শে নভেম্বর প্রায় দু'টার সময় (স্থানীয় সময়) অ্যালাবামার উপর প্রকাণ্ড একটা উল্কা বিস্ফোরিত হয় এবং ১০ পাউণ্ড ওজনের একটা টুক্‌রা অ্যালাবামার সাইলাকজায় একটা

বাড়ীর ছাদ ভেদ করে গিয়ে মিসেস হিউলেট হজেসকে আঘাত করে।

১৯২৭ সালের ২৮শে এপ্রিল ৯টার সময় (স্থানীয় সময়) জাপানের আবা নামক স্থানে অনুরূপ আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। ওজনে এক আউন্সের ৩০ ভাগের একভাগ মাত্র—ছোট্ট একটা উল্কাপিণ্ড ছুটে এসে মিঃ ট্যাবেল কুরিয়ামা নামে একজনের পাঁচ বছরের (তখনকার) মেয়েকে আঘাত করে। এই দুটি ঘটনার সময়ের ব্যবধানের মধ্যে উল্কাপাতে সম্পত্তি ধ্বংসের আরও দুটি লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে। ১৯০৮ সালের ২৪শে জুন পেনসিলভ্যানিয়ার চিকোরার নিকটবর্তী একটা মাঠে চামড়া ছিন্নভিন্ন অবস্থায় একটা গরু পাওয়া যায়—দেখে মনে হয়েছিল কতকগুলি প্রস্তর খণ্ডের আঘাতেই এরূপ ব্যাপার ঘটেছিল।

ঘটনায় দেখা যায় একটা উল্কাপাতের ঠিক পরক্ষণেই এবং নিকটবর্তী মাঠে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্কার প্রস্তর-টুক্‌রাগুলি পাওয়া যায়। আর একটা ক্ষতিকারক উল্কাপাত ঘটেছিল ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে, ইলিনয়ের ম্যাকোপিন কাউণ্টির রেন্‌ল্ড নামক স্থানে। প্রায় ৪ পাউণ্ড ওজনের একটা উল্কা-প্রস্তর একটা গ্যারেজের ছাদ চূর্ণ করে সেখানে অবস্থিত একটা মোটরগাড়ীর ছাদ, বসবার কুসন এবং তলা ভেদ করে চলে যায়। তারপর সেখান থেকে গিয়ে মেঝেতে আঘাত করবার পর উল্টে ফিরে গিয়ে আসনের স্প্রিং-এর মধ্যে আট্‌কা পড়ে।

আধুনিক যুগের এই ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর প্রাচীন ঘটনাগুলি রীতিমতভাবে যাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে—অকস্মাৎ যেন অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। সব চেয়ে প্রাচীন ঘটনাটি বাইবেলে আছে—যেমন যসুয়া ১০ : ১১-তে বলা

হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছিল বোধহয় প্রায় খৃঃ পূঃ ১৫০০ সালে। এতে কত লোক প্রাণ হারায় বাইবেলে তার উল্লেখ নেই। উল্কাপাতের ফলে পরবর্তী হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল ১৫১১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ইটালীতে। ক্রেমা নামে ছোট একটা সহরের উপর আকাশেই প্রকাণ্ড একটা উল্কা বিস্ফোরিত হয়ে হাজার হাজার পাথরের টুক্‌রা সমগ্র অঞ্চলটার উপর বিক্ষিপ্ত হয়। এর ফলে অনেক পাখী, কতকগুলি মেষ এবং একজন ফ্র্যানসিস্‌কান মঠবাসী নিহত হয়।

এর প্রায় ১৫০ বছর পর, ১৬৫৪ সালে সুদূর প্রাচ্য থেকে একটা বাণিজ্য জাহাজ ইটালীর একটি বন্দরে ফিরে আসে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের বিবরণ থেকে জানা যায়—৯ পাউণ্ড ওজনের একটা পাথর প্রচণ্ড গতিতে জাহাজের ব্রিজের উপর পড়ে' দুজন নাবিক নিহত হয়। যতই আমরা বর্তমান কালের দিকে এগুতে থাকি উল্কাপাতের লিপিবদ্ধ বিবরণ ততই বেশী হতে দেখা যায়। ১৮২৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী ভারতবর্ষে ওরিয়াঙে উল্কাপাতের ফলে একব্যক্তি নিহত হয় এবং তার সঙ্গী স্ত্রীলোকটি বিশেষভাবে আহত হয়। ১৮২৭ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী উল্কাপাতের ফলে ভারতবর্ষের একজন লোকের একটি বাহু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ১৮৩৬ সালের ১১ই নভেম্বর ওহায়োর নিউ কংকর্ডে উল্কাপাতে একটা ঘোড়া নিহত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাকী অংশে এরূপ আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি।

১৯০৮ সালের ৩০শে জুন মধ্য সাইবেরিয়ায় উল্কাপাতের ফলে সাইবেরিয়ান উপজাতীদের অনেকগুলি গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯২৩ সালের পূর্বে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানাই যায় নি। সাইবেরিয়ায় এই উল্কা পতনের কয়েক বছর পর উত্তর

জার্মেনীতে আর একটি উল্কাপাত হয়। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। উল্কাটা একটা শুষ্ক ঘাসের স্তূপে পড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, সেই আগুনে কতকগুলি ভেড়া পুড়ে মারা যায়।

এই তালিকা সত্ত্বেও উল্কাপাতটাকে দৈনন্দিনের একটা বিপজ্জনক ব্যাপারের মধ্যে ফেলা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক বছরে কোন এক সময়ে কখনও এই 'সংখ্যাতাত্ত্বিক অসম্ভব'ও সম্ভব হয়ে থাকে।

মহাশূন্যযান এবং উল্কার বিপদ

পৃথিবী পরিক্রমার জন্যে যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরিত হবে, তার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটিকে মানুষের পক্ষে যতটা সাধ্য, ততটা পালিশ করা হবে। কারিগরদের কাজের পরিচ্ছন্নতা অথবা কেবল সুন্দর দেখাবার উদ্দেশ্যে উপগ্রহগুলিকে দর্পণের মত পালিশ করবার সিদ্ধান্ত করা হয় নি। এর পিছনে একটা সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য রয়েছে। পৃথিবীর কাছাকাছি মহাশূন্যে কি পরিমাণ মহাজাগতিক ধূলিকণা আছে, সেটা সঠিকভাবে নির্ণয়ের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুব সহায়ক হবে। এর সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক কারণ জড়িত আছে, সেটা খুবই সরল। তুলনামূলকভাবে গৃহস্থলীর সম্পর্কিত একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—মনে করুন একটা বারান্দার মেঝে খুব সতর্কতার সঙ্গে চমৎকারভাবে পালিশ করা হয়েছে। এই চকচকে মেঝে থেকে অতি সুন্দরভাবে আলো প্রতিফলিত হবে, কারণ তখনও পর্যন্ত মেঝের উপর কেউ পা দিয়ে মাড়ায় নি। কিন্তু মেঝের উপর দিয়ে সারা দিনে অনেক লোক চলাফেরা করবার পর দেখা যাবে—মেঝে থেকে প্রতিফলিত আলো কতটা ম্লান হয়,

তাহলে আলোর ঔজ্জ্বল্যের ক্রমাবনতি থেকে অনায়াসে হিসেব করা যেতে পারে, সেখান দিয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতলোক যাতায়াত করেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের দর্পণের মত পালিশ সেইরূপ উদ্দেশ্যই সাধন করবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখতে চান, উপগ্রহটার সঙ্গে ধূলিকণার কতবার সংঘর্ষ ঘটেছে। মহাকাশযাত্রী কাউকে যেসব কঠিন বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হবে, তাদের অধিকাংশই হলো খুব সূক্ষ্ম ধূলিকণা। সম্ভবতঃ এই ধূলিকণা পলিমাটির অতিসূক্ষ্ম কণিকার মত একই রকমের হবে। কিন্তু ধূলিকণাগুলি অতি উচ্চ গতিতে ছুটাছুটি করে। এই রকমের উচ্চ গতিসম্পন্ন কোন একটা কণিকা যদি কৃত্রিম উপগ্রহের গায়ে এসে আঘাত করে তবে এই সংঘাতের গতিবেগ হবে সম্ভবতঃ সেকেণ্ডে প্রায় ৪০ মাইল।

এই উচ্চগতি সম্পন্ন সূক্ষ্ম ধুলিকণা যখন কৃত্রিম উপগ্রহটার ধাতব আবরণের উপর আঘাত করবে—আশাকরা যায়—তখন এই হঠাৎ থেমে-যাওয়া কণিকা সোজা বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু কেবল ধূলিকণাটিই নয়, যে তাকে বাধা দিয়েছিল, উপগ্রহের আবরণের সেই সূক্ষ্ম ধাতব পদার্থটুকুও বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। সংঘাতের পর ধাতব আবরণটিতে সূক্ষ্ম একটি গর্তের—সম্ভবতঃ আণুবীক্ষণিক—সৃষ্টি হবে। যত সময় যাবে ধাতব আবরণটি এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গর্তে আবৃত হয়ে যাবে এবং অনেকটা ম্লান দেখাবে। কাজেই কক্ষপথে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এবং তার পরেও নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে যদি উপগ্রহটার ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপ করা যায়, তাহলে কি পরিমাণ মহাজাতিক ধূলিকণা গ্রহটাকে আঘাত করেছে তার একটা ধারণা করা যাবে।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় ধরুন এক চতুর্থ ইঞ্চি ব্যাসের উল্কার

কৃত্রিম উপগ্রহটার সংঘর্ষ ঘটেছে কিনা, তা কি আমরা এথেকে জানতে পারি ? আমরা সে কথাও বলতে পারি—কিন্তু এই উপায়ে নয় ; একথা জানবার জন্যে অন্য কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কৃত্রিম উপগ্রহটার ভিতরে স্বাভাবিক চাপের বাতাস রেখে তাকে বায়ুনিরোধক করা। ভিতরকার যন্ত্রাদির জন্যে এই বায়ু-চাপের প্রয়োজন নেই—বায়ুশূন্য স্থানে থাকলে যেমন হয়, এটা ঠিক তেমন ভাবেই কাজ করবে। কিন্তু ধরা যাক—উপগ্রহটার মধ্যে অন্ততঃ এমন ভাবে তৈরী একটা যন্ত্র আছে, যেটা বায়ুশূন্য স্থানে মোটেই কাজ করবে না। যদি সেই যন্ত্রটা হঠাৎ থেমে গিয়ে রেডিওপ্রেরক যন্ত্রের সঙ্কেত প্রেরণ বন্ধ করে দেয়—তখনই বুঝা যাবে উপগ্রহের ভিতরটা তখন বায়ুশূন্য হয়ে গেছে। যার অর্থ হলো এই যে বেশ বড় এবং ভারী একটা উল্কাপিণ্ডের আঘাতে উপগ্রহটার আবরণে ছিদ্র হয়ে গেছে, যার ফলে ভিতরের আবদ্ধ বাতাস মহাশূন্যে বেরিয়ে গিয়ে উপগ্রহটাকে বায়ুশূন্য করে ফেলেছে।

উপগ্রহের সঙ্গে কতবার এরূপ সংঘর্ষ ঘটবার সম্ভাবনা আছে? এর উত্তরে বলা যায়—কোন বিশেষজ্ঞই এতে আশ্চর্য হবেন না—হয়ত একটানা মাসের পর মাসও এরূপ কোন সংঘর্ষ ঘটবে না। কয়েক বছর পূর্বে মার্কিন বিমান বাহিনী ঠিক এরূপ সমস্যা সম্পর্কেই অতি সতর্কতার সঙ্গে কতকগুলি হিসাব তৈরী করেছিলেন। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, মহাশূন্যে আমাদের এমন একটা কিছু আছে যার ১০০০ বর্গফুটের মত একটা খুব বড় রকেট বা মধ্যমাকৃতি এরোপ্লেনে জায়গার একটা খোলা জায়গা আছে। হিসাবে দেখা যায়—ঐ পরিমিত জায়গায় গড়পড়তা প্রতি সাড়ে তিন ঘণ্টা পর পর এক একটা মহাজাগতিক ধূলিকণা আঘাত করবে। এর চেয়ে বড় কিছুর সংঘর্ষ

পেতে হলে আরও অনেক লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে। একটা দশ পয়সা যতটা পুরু তার অর্ধেক মাপের ব্যাসের একটা উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে ১৫ বছরে একবার মাত্র সংঘর্ষ ঘটতে পারে। ঐ পরিমান স্থানে ২৩,৮০০ বছরে ১/৫ ইঞ্চি ব্যাসের একটা উল্কা-পিণ্ডের একবার মাত্র সংঘর্ষ ঘটবার সম্ভাবনা।

যদি একথা স্মরণ করা যায় যে, প্রতিদিন ১/৫ ইঞ্চি আকারের দশ লক্ষ উল্কাপিণ্ড এসে পৃথিবীর বুকে আঘাত করছে, তাহলে উপরের হিসেবটা একান্তই হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। উপরের সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে মাত্র ১০০০ বর্গফুট স্থানের জন্যে। ২০ ইঞ্চি কৃত্রিম উপগ্রহের উন্মুক্ত জায়গা হলো মাত্র ২ বর্গফুট। খুব সম্ভব এরূপ উপগ্রহের সঙ্গে এমন কোন উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষ ঘটবে না, যে এর আবরণ ভেদ করে যাবে।

আমাদের দ্বিতীয় শুকতারা

একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, এক-শ লোকের মধ্যে অন্ততঃ একজনও বুধ গ্রহটা দেখেছে কিনা-সন্দেহ। এর কারণ এ নয় যে এর উজ্জ্বল্য খুব কম, বরং তার বিপরীত। বুধগ্রহকে যদি উর্ধ্বাকাশে অন্যান্য স্থির নক্ষত্রের সঙ্গে দেখা যেত, তাহলে একে অন্যান্য তারার মতই ঔজ্জ্বল মনে হতো। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে বুধগ্রহ দিনের বেলায় ছাড়া অন্য সময়ে উর্ধ্বাকাশে আসে না। তখন সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে অন্যান্য তারার মতই অদৃশ্য হয়ে যায়। বুধ হলো সৌরজগতের সবচেয়ে ভিতরের গ্রহ। এটা সূর্যের সর্বাধিক নিকটে থেকে অভাবনীয় গতি বেগে সূর্যের

চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্যের চারিদিক একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে আমাদের পৃথিবীর দিনের হিসাবে ৮৮ দিন, এটা সৌর মণ্ডলের সবচেয়ে ভিতরকার গ্রহ হওয়ার ফলে পৃথিবী থেকে সর্বদাই একে সূর্যের খুব কাছাকাছি দেখা যায়। বুধগ্রহকে যখন সন্ধ্যাতারা রূপে দেখা যায় তখন সূর্য অস্ত যাবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই এটিও অস্তগমন করে। প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভবতঃ সূর্যের সঙ্গে একই সময়ে অস্তগমন করে। বুধগ্রহ যখন প্রভাতী তারারূপে দেখা দেয় তখন দিকচক্র রেখায় সূর্যের কিছুটা আগে থাকে।

এসব কারণে বুধগ্রহকে আলো-আঁধারীর তারা বলা যেতে পারে; কারণ একে কখনও নীল আকাশের গায়ে দেখা যায় না। এর চতুর্দিকের আকাশ সর্বদাই সূর্যের আলোয় কখনও কম, কখনও বেশী আলোকিত থাকে। অধিকন্তু এই গ্রহটা সর্বদাই দিগন্তে নীচের দিকে থাকে এবং অনেকেই লক্ষ্য করেছেন—বুধগ্রহ আকাশে থাকা সত্ত্বেও কুয়াশা, ধূলিকণা বা সাধারণ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রত্যেকেই বিস্ময় বোধ করেন যে, যাকে প্রায়ই দেখা যায় না, যখন দেখা যায়—তখনও আবার বেশীক্ষণের জন্যে পর্যবেক্ষণ করা যায় না এবং সর্বদাই একটা অসুবিধা-জনক স্থানে অবস্থান করে—তার সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেমন করে তথ্যাদি সংগ্রহে কৃতকার্য হয়েছেন!

যাহোক, বুধগ্রহ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানা গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—বুধগ্রহের ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৩০০০ মাইল। এটা আমাদের চন্দ্রের ব্যাসের চেয়ে খুব একটা বেশী নয়—কারণ চন্দ্রের ব্যাস হচ্ছে ২১৬০ মাইল। তবে অন্যান্য কয়েকটা গ্রহের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের চেয়ে কম। শনিগ্রহের সবচেয়ে বড় চন্দ্র টাইটানের ব্যাস হচ্ছে ৩৫৫০ মাইল এবং বৃহস্পতির চারটি বড়

চন্দ্রের দুটি—গ্যানিমিড ও ক্যালিষ্টো ব্যাসের মাপে বুধগ্রহকে ছাড়িয়ে গেছে। এদের উভয়েরই ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৩২০০ মাইল করে।

বেশ কিছুকাল আগেই জানা গিয়েছিল যে, বুধগ্রহ যে পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেটা বৃত্তাকার নয়, বরং বৃত্তাভাসই বলা যেতে পারে। এই পথে ভ্রমণ করবার সময় গ্রহটা যখন সূর্যের খুব নিকটে আসে (বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় পেরিহেলিয়ন) তখন সূর্য থেকে তার দূরত্ব হয় দুই কোটি পচাশি লক্ষ মিলিয়ন মাইল, আর যখন সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে (যাকে বলা হয় এফেলিয়ন), সেই দূরত্বটা হলো তিন কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ মাইলের সামান্য কিছু কম।

কয়েক শ' বছর ধরে একটা জিনিষ রহস্যময়ই রয়ে গেছে—সেটা হলো, বুধগ্রহ তার নিজের অক্ষরেখার উপর কত দ্রুত-গতিতে আবর্তিত হয়, অথবা অন্যভাবে বলা যায়—বুধগ্রহের একদিনে, অর্থাৎ একবার আবর্তনে কত সময় লাগে ? ইটালীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওভ্যানী ভি. সিয়াপেরিলি এক অসম-সাহসিক প্রচেষ্টায় দিনের বেলায় বুধগ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। দিনের আলোতে খালি চোখে এই গ্রহটাকে দেখা না গেলেও, অবস্থানস্থল জানা থাকলে টেলিস্কোপের সাহায্যে একে দেখা যেতে পারে।

কয়েক বছরের চেষ্টার পর সিয়াপেরিলি এই সমস্যা সমাধানে সক্ষম হন। তিনি বললেন—আমাদের ৮৮ দিনে বুধগ্রহ তার অক্ষরেখার উপর একবার আবর্তন করে, অর্থাৎ সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসতে এর যত সময় লাগে, নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার পাক খেতেও তার ততো সময় লাগে। এর ফলে বুধগ্রহের এক অর্ধাংশই মাত্র সূর্যের আলো পায়। এর ফলে এর

সূর্যালোকিত অংশের রৌদ্রশক্ত হবার কথা। সেখানে যদি কোন ধাতব পদার্থ থেকে থাকে, তবে সেগুলি নিশ্চয়ই তরল অবস্থায় আছে। বুধগ্রহ যখন পেরিহিলিয়নে অবস্থান করে, অর্থাৎ সূর্যের খুব নিকটে থাকে, তখন সূর্যালোকিত পৃষ্ঠের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা ৭৮০° ফারেনহাইটের কম হবে না। এত বেশী তাপ-মাত্রায় দস্তা, টিন, সীসা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ গলে গিয়ে পাথুরে জমির উপর ছোট ছোট পুকুরের আকার ধারণ করবে।

এছাড়াও সেখানে আরও রহস্যপূর্ণ ব্যাপার আছে। প্রত্যেকবার বুধগ্রহ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আসে—শেষেরবার যেমন ১৯৫৭ সালের মে মাসে এসেছিল—তখন আমরা এই গ্রহটিকে সূর্যের গায়ে একটা কালো বিন্দুর মত দেখতে পাই। একে বলা হয়—ট্র্যানজিট, অর্থাৎ সূর্যের উপর দিয়ে গ্রহের গতি এবং বিগত 'ট্র্যানজিট সমূহ' থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেছে—বুধ একটি একক গ্রহ। বুধের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটা কালো বিন্দু দেখা গেলে সেটাকে বুধের চন্দ্র বলেই মনে হতো—কিন্তু বুধের কালো বিন্দুর সঙ্গে আর কোন কালো বিন্দুই দেখা যায় নি। এই ট্র্যানজিট, অর্থাৎ সূর্যের উপর দিয়ে বুধগ্রহের গতি থেকে আরও জানা যায় যে; বুধগ্রহের বায়ুমণ্ডলও নেই।

অপরপক্ষে গ্রহটির পৃষ্ঠদেশে যেসব কালো দাগ দেখা যায়, সেগুলি সময়ে সময়ে খুব উজ্জ্বল এবং সময়ে সময়ে নিষ্প্রভ দেখায়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সেখানে বায়ুমণ্ডল আছে অথবা অন্ততঃ পক্ষে বায়ুমণ্ডলের কিছুটা এখনও রয়ে গেছে, তাহলে এ ব্যাপারটার বেশ ভাল ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এ কথাটাই বিশ্বাস করবার ঝোঁক দেখা যায় যে, সবগুলি গ্রহই প্রথমে বায়ুমণ্ডল নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল। তা-ই যদি হয়ে

থাকে তবে বুধগ্রহের বায়ুমণ্ডলের কি হলো? এ রকম প্রচণ্ড বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থেকে বায়ুর অণুগুলি এমন প্রচণ্ডবেগে ছুটাছুটি করতে থাকে যে, গ্রহের টান তাদের আর ধরে রাখতে পারে না—কতকগুলি মহাশূন্যে চলে যায় কিন্তু সবটাই একসঙ্গে যায় না। গ্রহের যেখানটায় সূর্যকিরণ পড়ে না, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানটায় গিয়ে জমা হয়—সেখানে তাপমাত্রা হিসেব মত শূন্য ডিগ্রির নীচে -৪১৪° ডিগ্রি ফারেনহাইট। যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায়—অধিকাংশ না হলেও বুধগ্রহের প্রাথমিক বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই তার ছায়াচ্ছন্ন অংশের পৃষ্ঠদেশে জমাট বেঁধে আছে। কিন্তু আপাততঃ এই ধারণার সত্যতা যাচাই করবার উপায় নেই।

মঙ্গলগ্রহ—লালমাটি ও ওজোন

একদিন রাত্রিবেলায় পরিষ্কার আকাশে মঙ্গলগ্রহ-পর্যবেক্ষণ করবার সময় আমার মনে হলো—একমাত্র পরিষ্কার আকাশেই যে দেখবার মত কত জিনিষ রয়েছে যা অনেকেই দেখতে পায় না। মাত্র ছয় কি সাত মাইল উপরেই পশ্চিম থেকে পূবে সুতীব্র বায়ুস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে—এই আপাত-প্রতীয়মান এই 'স্থায়ী' বায়ুপ্রবাহ সময়ে সময়ে ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়ে থাকে। অত উচ্চতায় কোন মেঘও নেই যে এই বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্ব বুঝা যেতে পারে। কাজেই যখন বায়ুস্রোত বেশ নীচুতে প্রবাহিত হচ্ছিল, সেই সময়ে কোনও একজন বৈমানিক সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত আমরাও জানতে পারি নি যে, এরকমের একটা বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্ব আছে।

এই বায়ু স্রোতটা যেন তার খেয়াল খুশীমত উচ্চতা এবং গতি-বেগ পরিবর্তন করে। এর একটা ব্যাপারে মাত্র নিয়মানুবর্তিতা

দেখা যায়, সেটা হচ্ছে এই যে, বায়ু স্রোতটা সর্বদাই সাধারণতঃ পূর্বাভিমুখেই প্রবাহিত হয়। বায়ুস্রোতটা যখন নীচু দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এর সঙ্গে চালিত পূর্বদিকগামী কোন বিমানপোতের লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছাবার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একঘন্টা কম লাগতে পারে।

টোকিও থেকে বিশাল আকৃতির কাগজের বেলুন পাঠিয়ে জাপানীরা আমেরিকার প্রধান ভূমিখণ্ডে যে বোমা নিক্ষেপ করে-ছিল, এই বায়ুস্রোতই সেই বেলুনগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই বায়ুস্রোত সেই বেলুনগুলি, অর্থাৎ বোমাগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল বটে, কিন্তু দৈবক্রমেই তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি সাধিত হয় নি।

এই বায়ুস্রোতের উপরে বায়ুমণ্ডলে আর একটি অদ্ভুত অদৃশ্য স্তর আছে। একে ওজোন স্তর বলা হয় এবং আমি যখন মঙ্গল গ্রহটাকে দেখছিলাম, তখন এই ওজোন স্তরটার কথাই প্রথম আমার মনে হয়। সঙ্গত কারণেই পরিচিত এই গ্যাসটা অতি সাধারণ অক্সিজেন গ্যাসেরই একটা রকমফের মাত্র। শ্বাসকার্যে যে অক্সিজেন অপরিহার্য, সেই অক্সিজেনেরই দুটি পরমাণু একত্রিত হয়ে একটি অক্সিজেন অণু গঠন করে। কিন্তু প্রায় এমন ঘটনা ঘটে যাতে অক্সিজেন অণুর পরমাণু দুটি পৃথক হয়ে যায়। বিদ্যুৎ-স্ফুরণের দ্বারা এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারে এরূপ অবস্থা ঘটতে পারে। তখন কিছুক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ পৃথক এক একটি অক্সিজেন পরমাণু পাওয়া যায়। যদিও খুব অল্প সময়ের জন্যে হোক, এই একক পরমাণুগুলি সঙ্গে সঙ্গেই এক একটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এর ফলেই তিনটি পরমাণুযুক্ত একটি অক্সিজেন অণু উৎপন্ন হয়—একেই বলা হয় ওজোন।

ওজোন তৈরী হলেও সেটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ওজোন অতিমাত্রায় সক্রিয় পদার্থ। যে কোন পদার্থই কাছে আসুক না কেন, তার সঙ্গেই মিলিত হবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে অবশ্য সে পদার্থটা যদি জারিত হবার যোগ্য হয়। একথা অবশ্য ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন নেই যে, অতিমাত্রায় সক্রিয় কোন পদার্থকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয়, যে হেতু সেটা ত্বরিৎ গতিতে যে কোন একটা যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করবে। সে জন্যেই কয়েক বছর পূর্বে বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটা ওজোনের স্তর দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে যান। এই ওজোন স্তরের নীচের দিকটা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬৫,০০০ ফুট উপরে এবং সেখান থেকে স্তরটা উপরের দিকে বিস্তৃত।

'ওজোন স্তর' কথাটাতে যেন ভুল বুঝা না হয়। এই স্তরে যে কেবল বিশুদ্ধ ওজোনই রয়েছে, তা নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত রয়েছে। ওজোন স্তরে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য স্থানের চেয়ে কিছু বেশী ওজোন আছে মাত্র। এমন কি, সেখানেও তেমন কিছু বেশী নয়।

কেউ যদি ওজোন স্তরের সবটুকু ওজোন পৃথক করে নিয়ে তাকে সমুদ্র-পৃষ্ঠের বায়ুর চাপে ঘনীভূত করে, তাহলে সেই স্তর মাত্র এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পুরু হবে। কিন্তু অতটুকুও বেশ বিস্ময়ের ব্যাপার, যদিও এই জিনিসটা যখন জানা গেল তখন সেখানে কি ব্যাপার চলেছে, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় নি।

সেই উচ্চতায় সূর্য থেকে আগত আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি নিয়মিত-ভাবে কিছু অক্সিজেন অণু আলাদা করে ওজোন উৎপন্ন করে। যে পরিমাণ আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীতে আসে তার সবটাই এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এই ওজোন-অণুগুলি তখন বায়ুমণ্ডলের

নীচের দিকে চলে আসে এবং বায়ুবাহিত ধূলিকণার সঙ্গে রাসায়নিক-ভাবে মিলিত হয়।

এসব ব্যাপারের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের সম্বন্ধ কি? খুব সহজ। মঙ্গলগ্রহের মরুভূমির মত স্থানগুলি আয়রণ অক্সাইডের মত লালচে দেখায়। মঙ্গলগ্রহে বাতাস খুবই হাল্কা অর্থাৎ বিরল এবং মনে হয়, সেই বাতাসে এখন আর অক্সিজেন নেই। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল খুব হাল্কা বলেই সেখানকার ওজোন স্তর মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের খুব নিকটেই গঠিত হয়েছে এবং অতিমাত্রায় সক্রিয় হওয়ার ফলে ওজোন মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের প্রস্তরাদির সঙ্গে খুব তাড়াতাড়িই মিলিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় দুটি ফল হয়েছে—মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ জারিত হয়ে গেছে এবং বায়ুমণ্ডল থেকে সবটুকু অক্সিজেন স্থায়ীভাবে দূরীভূত হয়েছে।

এই অনুমান যদি ঠিক হয়, এবং যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়, তবে আমরা একথা জেনে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, আমাদের পৃথিবীর ওজোন স্তর ৬৫,০০০ ফুট উপরে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত।

মহাশূন্য থেকে ব্যাক্টিরিয়া?

ধরা যাক, মোটামুটি প্রায় প্রত্যেক ২০ বছর পরে পৃথিবীর কোন জায়গায় যখন মহামারী দেখা দেয়, কেউ না কেউ তখন নিশ্চয়ই এইরূপ মন্তব্য সমেত বিবরণ রাখবেন যে, শূন্য থেকে আগত ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারাই এই মহামারী সৃষ্টি হয়েছে। একথা যিনিই বলুন না কেন, তিনিই বিখ্যাত সুইডিস বিজ্ঞানী আরহেনিয়াসকে সাক্ষীস্বরূপ খাড়া করতে পারেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আরহে-নিয়াস এক মতবাদ প্রচার করেছিলেন যে, আকাশ বাতাস সর্বত্র

কষ্টসহিষ্ণু সর্বপ্রকার আদিম জীবের বীজরেণুতে পরিপূর্ণ। কোন গ্রহ যখন ঠাণ্ডা হওয়ার পর জীবের জীবনধারণের উপযোগী অবস্থায় উপনীত হয় তখন এই সব বীজরেণু থেকেই নতুন জীবনের সূত্রপাত হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে কথাটা হচ্ছে এই যে, ব্যাক্টিরিয়ার বীজরেণু রূপে কষ্টসহিষ্ণু জীবনবীজগুলি যে আকাশে জীবন্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং ভেসে বেড়াবার মুখে কোন গ্রহে উপনীত হতে পারে—সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রত্যেক বছরেই মহাকাশ থেকে মহাজাগতিক ধূলিকণারূপে বিস্ময়কর পরিমাণে পদার্থ সমষ্টি আমরা পেয়ে থাকি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখেছেন যে, বছরের পর বছর এই মহাজাগতিক ধূলিকণার দরুণ প্রতিদিন ১০।১২ টন করে পৃথিবীর ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছর বিভিন্ন দুরধিগম্য স্থানের ধূলিকণার সতর্ক গণনা থেকে দেখা গেছে—এই সংখ্যা খুবই কম। এই মহাজাগতিক ধূলিকণা পতনের ফলে দৈনিক অন্ততঃ একশত টন করে পৃথিবীর ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের পৃথিবীতে যদি রোজ এই পরিমাণে মহাজাগতিক ধূলিকণা জমে থাকে তাহলে আকাশে যদি ব্যাক্টিরিয়ার রেণুকণা থেকেই থাকে, সেগুলিও এর সঙ্গে এসে জমবে না কেন?

এগুলি অবশ্য বস্তু পরিমাণের অপরিহার্য অঙ্গ। আকাশে ব্যাক্টিরিয়ার রেণুকণা আছে কিনা জানি না। তবে এটুকু মাত্র বলা চলে যে, এরূপ কিছু থাকা অসম্ভব নয়। কেউ কখনও এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু যাঁরা ব্যাক্টিরিয়া সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছেন তাঁরা অসাধারণ রাসায়নিক আগ্রহ নিয়ে এরূপ কয়েকটি ইঙ্গিত করতে পারেন এবং বলতে পারেন যে, সেগুলিকে পৃথিবী বহির্ভূত কোন স্থানের বলে তাঁদের সন্দেহ হয়। তিনি

অবশ্য যা খুশী তাই বলতে পারেন, কিন্তু সম্ভবতঃ প্রমাণ করতে পারেন না।

কিন্তু উল্কা প্রস্তরের মধ্যে কেউ যদি কোন অজানা আণুবীক্ষণিক জীবন আবিষ্কার করেন, সেটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, কারণ সেটা এসেছে মহাশূন্য থেকে। কিন্তু সেই আণুবীক্ষণিক জীবনের একটা নতুন রকমের আকৃতি থাকা দরকার। কারণ সাধারণ ঘটনা যা ঘটে তা হলো এই যে, প্রত্যেকটি উল্কাই পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করবার পর সংগৃহীত হয়ে থাকে। এবং যে কোন বস্তুই হোক, মাটি স্পর্শ করবার সময় তাতে ব্যাক্টিরিয়া সংশ্লিষ্ট হতে পারে। যে কোন শস্যক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত এক আউন্স মাটির মধ্যে প্রায় ৩ মিলিয়ন ব্যাক্টিরিয়া পাওয়া যেতে পারে। বনাঞ্চলের এক আউন্স মাটিতে এর তিন গুণ থেকে পাঁচ গুণ বেশী এবং বাগানের মাটিতে এর ১৫ গুণ বেশী ব্যাক্টিরিয়া থাকতে পারে।

সত্য সত্যই এসব পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে আগত অনেক উল্কা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু এতে একটা সমস্যার ব্যাপার ছিল। উল্কাপিণ্ডগুলি মাটি থেকে সংগৃহীত হয়েছিল অনেক আগে। পরিষ্কারই বুঝা যায়—তখনই এগুলির সঙ্গে ব্যাক্টিরিয়ার সংযোগ ঘটেছিল। অবশ্য পাথরকে জীবাণু মুক্ত করা সহজ ব্যাপার; দু-এক ঘণ্টার জন্যে পুড়িয়ে লাল করলেই হলো! কিন্তু পাথরের ভিতরে কোন জীবাণু থেকে থাকলে এ-ব্যবস্থায় সেগুলিও যে নষ্ট হয়ে যাবে!

তবে ষ্টেরিলিজেসনের অর্থাৎ বীজাণুশূন্যকরণের ব্যবস্থায় পাথরের উপরিভাগের বীজাণুগুলিই নষ্ট হবে—ভিতরে যদি কিছু থেকে থাকে সেগুলি অবিকৃত থাকবে। কাজেই উল্কাপিণ্ডগুলিকে প্রথমে অ্যান্টি-সেপ্টিক সাবান দিয়ে ব্রাস করে নিয়ে সেগুলিকে আবার অ্যান্টি-

সেপ্টিক সলিউসনে ঘণ্টা চারেকের জন্যে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর সেগুলিকে ১৯০-প্রুফ অ্যালকোহলের মধ্যে মিনিট খানেকের জন্যে ডুবিয়ে রাখবার পর অ্যালকোহলটা পুড়িয়ে নেওয়া হয়। তখনই কেবল বীজাণুশূন্য টিউবে রক্ষিত ব্যাক্টিরিয়াবৃদ্ধির উপযোগী সলিউসনের মধ্যে পাথরটাকে রাখা হয়েছিল। ২৮ সপ্তাহ ধরে এই অবস্থায় রাখা সত্ত্বেও কালচার সলিউসনটা পরিষ্কারই রয়ে গেল, কাজেই বুঝা গেল—তাতে কোন ব্যাক্টিরিয়া নেই। তারপর উল্কাপিণ্ডটাকে জীবাণুবর্জিত-করা মর্টারে চূর্ণ করে কালচার সলিউসন ভর্তি ১২টি টিউবে ভাগ করে রাখা হলো। আরও দশ সপ্তাহ পরে ১২টি টিউবের তিনটির মধ্যে ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি দেখা গেল; কিন্তু সেগুলি পৃথিবীরই পরিচিত ব্যাক্টিরিয়া। এসব পরীক্ষা থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। পরীক্ষার ফল নাস্তিত্বমূলক, কিন্তু সেটা কম-বেশী পূর্বেই আশা করা গিয়েছিল। আমরা নিজে মহাশূন্যে যেতে না পারা পর্যন্ত শেষ কথা জানবার জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে।

মহাশূন্য যাত্রীদের জন্যে খাদ্য-বটিকা পাওয়া যাবে না।

আমি এখন যে কোন দিন একটা টেলিভিশন দৃশ্য দেখবার জন্যে আশা করে থাকি—যাতে এই দৃশ্যটি থাকবে—চন্দ্রলোক অথবা মঙ্গলগ্রহে প্রথম অভিযাত্রী কর্মীদল, উজ্জ্বল দৃষ্টি এবং কর্মীজনোচিত চেহারার যুবকেরা প্রাতরাশের জন্যে বসে আছেন। তাঁরা পেটভরে খাচ্ছেন এবং বৃদ্ধ মেন সার্জেন্ট তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছেন। অনেক দিনের জন্যে এই হলো তাঁদের শেষ খাওয়া। লিখিত আছে—

ফিরে না আসা পর্যন্ত এখন থেকে তাঁরা খাদ্য বটিকা খেয়েই থাকবেন।

অধিকাংশ লোক এরকমের একটা দৃশ্য দেখে সম্ভবতঃ বিসদৃশ কিছু মনে করবে না; কোন অজ্ঞাত কারণে খাদ্য-বটিকার ধারণাটা লোকের মনে যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। প্রথমে কে এই ধারণার বিষয় বলেছিলেন, সেটা আমার জানা নেই (আমার অনুমান হয়, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ই ছিলেন সে ব্যক্তি); কিন্তু সে যেই হোন না কেন, তার যুক্তিটা পরিষ্কার নয়।

একটা লোককে কর্মক্ষম এবং সক্রিয় রাখতে দৈনিক প্রায় দু-পাউণ্ড খাদ্যের দরকার—তারমধ্যে বেশীর ভাগই শ্বেতসার এবং প্রোটিন। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে হাইড্রলিক প্রেসের পিষ্টনের চাপ দিয়ে শ্বেতসার পদার্থকে স্বল্পায়তনের মধ্যে আনা যায়। কিন্তু এই জাতীয় খাদ্য একবার চেপে স্বল্পায়তনের মধ্যে আনলে, তাকে কিছুতেই হজম করা যাবে না, সম্ভবতঃ চাপের পর সেটা আর শ্বেতসার থাকবে না এবং আমি ভেবে শিউরে উঠি যে, প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকেও এরকমভাবে ব্যবহার করলে সেটা আবার কি হয়ে দাঁড়াবে!

অবশ্য শ্বেতসারকে ক্যাণ্ডির মত বটিকার আকারে তৈরী করা যেতে পারে—কিন্তু সেটা কর্মীদের বিরক্তিরই কারণ হবে। কিন্তু এরূপ একটা বটিকায় পুরা আহারের কাজ চলবে না, একবাটি ভর্তি এরকম জিনিষের প্রয়োজন হবে। সংক্ষেপে বলা যায়—দু-পাউণ্ড খাদ্য—দু-পাউণ্ড খাদ্যই বটে; এবং আলোচনার ফলে সেটা কমে যাবে না।

একথা সত্য, মহাশূন্য-যানে যেরূপ খাদ্য দেওয়া হবে, সেটা ভাল একটা রেঁস্তোরাতে যেসব খাদ্য পরিবেশন করা হয় তার চেয়ে

অনেক ভিন্ন রকমের দেখাবে। রেঁস্তোরার খাদ্যের ওজনটা বিবেচ্য বিষয় নয়। এই খাদ্যে বাজে অংশ এবং অখাদ্য অংশ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ খাদ্যের ওজনের অর্ধেক ডিনারের জন্যে টেবিলে দেওয়া হবে। কিছুদিন পূর্বে আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তাতে ছিল—মাংসের স্টীক, পোড়ানো আলু এবং আর্টিচোক মাত্র। এটা সাধারণের একটা অনুষ্ঠান ছিল বলে, তার ওজনটা পাল্লায় তুলে দেখা সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু তাহলেও নিশ্চয় করে বলতে পারি স্টীকের হাড় এবং চর্বির কুচাকাচা বাদ দিলে সমগ্র ওজনের অর্ধেকটা দাঁড়াতো। আলুর যতটা বাদ দিতে হয়েছিল সেটাও তার পুরা ওজনের এক তৃতীয়াংশ হবে এবং আর্টিচোক এরও দুই তৃতীয়াংশ বাদ পড়েছিল।

কিন্তু ভূমিতে অবস্থান করবার সময় এতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু আকাশে, এমন কি পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথেও এক পাউণ্ড ওজনের জন্যে ১৫০ পাউণ্ড রকেট-জ্বালানী দ্রব্যের প্রয়োজন। স্পষ্টতঃই দেখা যায়—এরূপ খাদ্য নষ্ট হবার মত অংশই বেশী থাকে। কাজেই মহাকাশ-যানে স্টীক দিতে হলে আগেই সেগুলির হাড় সাবধানে ছাড়িয়ে নিতে হবে, আলুর বর্জনীয় অংশ আগেই বাদ দেওয়া দরকার এবং শাকসব্জীর খাদ্যোপযোগী অংশটুকুই কেবল রাখতে হবে, যেন পরিবেশিত খাদ্যের সবটুকুই খাদ্যোপযোগী হয়।

অপ্রয়োজনীয় ওজন বাদ দেবার বিষয়টা প্যাকেজিং-এর ব্যাপারেও স্মরণ রাখতে হবে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন দেখালেও গ্লাস জারের প্যাকেজিং সব চেয়ে ভারী। পুরা এক বোতল দুধের ওজন প্রায় তিন পাউণ্ড, বোতলটার ওজনই এক পাউণ্ড এক আউন্স। একটি জার ভর্তি বিটের ওজন—যদিও খুব ঘনীভূত খাদ্য নয়—এক পাউণ্ডের মত, কিন্তু জারটার ওজনই ১০ আউন্স।

ধাতব পাত্রই এর তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং জমাট খাদ্যের জন্যে অ্যালু-মিনিয়াম-পেপারের মোড়কই সর্বোৎকৃষ্ট।

কাজেই, খাদ্য-বটিকার কথা স্বপ্নেরই সামিল হয়ে যায় এবং প্রথমতঃ কখনও এটা সুখকর ছিল না। তবে মহাকাশ-কর্মীরা তাদের যথারীতি খাবার শেষ করে ইচ্ছা করলে একটা বটিকাও গলাধঃকরণ করতে পারেন—সেটা অবশ্য ভিটামিন-বটিকা।

আয়নের সাহায্যে চালিত মহাশূন্য-যান।

মার্কিন বিমানবাহিনী এখনও কোন মহাকাশ-যান তৈরী করছে না। কিন্তু তারা অনুশীলন-চুক্তি, অর্থাৎ ষ্টাডি কনট্র্যাক্ট-এর জন্যে ২০,০০০ ডলারে কিছু কম অর্থ আলাদা ভাবে রেখেছে। এই ষ্টাডি কনট্র্যাক্ট-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আয়ন ড্রাইভ' মহাকাশ-যান সম্ভব কিনা—সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা। এটা দূরদর্শী এবং অগ্রগামী চিন্তারই পরিচায়ক। কারণ অধিকাংশ পদার্থবিদ্‌ই এ-বিষয়ে একমত যে, আয়ন-চালিত যান, বায়ুমণ্ডলে হয়তো মোটেই কাজ করবে না, নয়তো কার্যক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং শক্তিহীন বলেই প্রমাণিত হবে। যদি তৈরী করা সম্ভব হয় তবে 'আয়ন ড্রাইভ' বা আয়ন-চালিত যান হবে এমন একটা জিনিষ যার প্রয়োজন হবে বায়ু-মণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে।

কিন্তু 'আয়ন ড্রাইভ' জিনিষটা কি ? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে 'আয়ন' শব্দটার ব্যাখ্যা দিয়ে সুরু করা যাক। ব্যাপারটা তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত সহজ। বৈদ্যুতিক চার্জ অর্থাৎ বিভব আছে এরূপ যে কোন পরমাণুকে আয়ন বলা হয়। এই কথা-

গুলিতে যা বুঝায়, একটি স্বাভাবিক পরমাণুর সেরূপ কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই।

এ কথা জানা আছে যে, একটা পরমাণুর মধ্যে একটা ভারী কেন্দ্রবস্তু বা নিউক্লিয়াস আছে। আর চারদিকে এক ঝাঁক ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিউক্লিয়াসে সর্বদাই পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ বহন করে; আর ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-আধান হচ্ছে নিগেটিভ। স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-বিভব কেন্দ্রবস্তুর পজিটিভ বিভবের সমান। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যের এসব সমতার দ্বারা একথা বুঝায় না যে, সবাইকে সব সময়ে সেই একই অবস্থায় থাকতে হবে।

কোন কোন অবস্থায়—যেমন তীব্রভাবে উত্তপ্ত অবস্থায় পরমাণু তার এক বা একাধিক ইলেক্ট্রন ছেড়ে দিতে পারে। তখন পরমাণুর পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ দ্বারা সাম্যাবস্থায় আসে না। তখন আমরা পাই পজিটিভ বিভবের পরমাণু অথবা পজিটিভ আয়ন। আবার এও হতে পারে—যত সংখ্যক ইলেকট্রন আছে তার সঙ্গে আরও দু-একটি যুক্ত হতে পারে। তখন আমরা পাই নিগেটিভ বিভবের পরমাণু অথবা নিগেটিভ আয়ন। কোন জাতীয় পরমাণু, সেটা খুব প্রয়োজনীয় কথা নয়—হিলিয়াম, লোহা, সোণা—প্রভৃতি যে কোন কিছুর পরমাণু হতে পারে। সর্বাধিক প্রয়োজন হলো—এদের কে কতটা বিদ্যুৎ-বিভব ধারণ করে।

যদি কোন পদার্থের সবগুলি অথবা অধিকাংশ পরমাণুকে যদি আয়নে পরিবর্তিত করা সম্ভব হতো তবে বৈদ্যুতিক উপায়ে সেগুলিকে ফোকাস করে রশ্মিতে পরিণত করা যেত (ঠিক টেলিভিশন টিউবের মধ্যে ইলেকট্রনের যেরূপ ঘটে) এবং সেই রশ্মিকে ইচ্ছামত যে কোন দিকে পিচকিরির মত জোরে ছুঁড়ে দেওয়া যেত। আয়ন

যেহেতু পদার্থেরই একটা অংশ, সেহেতু এর কার্যকারিতা হতো রকেট থেকে প্রচণ্ড বেগে নির্গত গ্যাসের মত। এগুলি নিশ্চয়ই ধাক্কা উৎপাদন করবে। এবং যেহেতু আয়নগুলি রকেট থেকে নির্গত গ্যাসের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে ছুটে বেরোয় সেহেতু অতি অল্প পরিমাণ পদার্থকে আয়নে পরিবর্তিত করে প্রচণ্ড ধাক্কা উৎপন্ন করা সম্ভব হবে।

এই হলো আয়ন ড্রাইভের তত্ত্বগত ব্যাপার এবং আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, এই তত্ত্বের মধ্যে কিছু ভুল নেই! কেমন করে একে কার্যকরী করা যাবে, সেটা আলাদা প্রশ্ন। এই অনুশীলন চুক্তির উদ্দেশ্য হলো, নির্বিঘ্নে এবং সম্ভব হলে যথা সময়ে প্রচণ্ড শক্তি-সম্পন্ন আয়ন রশ্মি উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং উপায় উদ্ভাবন করা।

যদিও এই 'আয়ন ড্রাইভ' সম্পর্কিত গবেষণা পরমাণুর সহায়তায়ই চলছে তথাপি এটা এবং পারমাণবিক শক্তি এক জিনিষ নয়। পরমাণুগুলি কতকগুলি জটিল ব্যবস্থায় বিদ্যুতাবিশিষ্ট, কিন্তু অন্যথায় তারা অপরিবর্তিত থাকে। স্বভাবতঃই বিদ্যুতাধানকে কোন জায়গা থেকে আসতে হয় এবং শক্তি উৎপাদনের জন্যে কোন রকমের উৎসের প্রয়োজন। কিন্তু এই শক্তি উৎপাদক উৎসের জন্যে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজন নেই। এর প্রবর্তক ধরে নিয়েছিলেম যে, এরজন্যে যে অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর এবং তার সঙ্গে রক্ষাবরণীর দরকার, সেগুলি এর পক্ষে খুবই ভারী হবে।

যাহাকে পারমাণবিক শক্তি কমিশন রকেট পরিচালনার জন্যে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের সমস্যাগুলির বিষয় চিন্তা করছেন। বিমান বাহিনী যে অনুশীলন চুক্তি সংস্থার কাছে 'আয়ন-ড্রাইভ' হস্তান্তরিত করেছে তা থেকে এই কথাই মনে হয় যে, পারমাণবিক

শক্তি বিশেষজ্ঞেরা 'আয়ন-ড্রাইভ' সম্পর্কে আগ্রহান্বিত নন বা এখনও আগ্রহান্বিত হন নি।

একটা সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো এই যে, কয়েক জন সুদক্ষ লোক কোন একটা সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত হলে তাঁরা সাধারণতঃ একটা উত্তর স্থির করে নেন। আগে থেকেই কেউ বলতে পারে না একটা উত্তর খুঁজে বের করতে তাঁদের কতটা সময় লাগবে, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক হবে। ভবিষ্যতে যে যান তৈরী হবে, এর ফলে তাদের আকৃতির পরিবর্তনও ঘটতে পারে।

পারমাণবিক শক্তি চালিত রকেট ?

শীঘ্রই হোক, কি বিলম্বেই হোক, কোন গোপন তথ্যই গোপন থাকে না—কখনও কখনও অদ্ভুত ভাবে এরূপ ব্যাপার ঘটে যায়। বেশ কিছুকালহলো পরমানবিক শক্তির সাহায্যে রকেট চালাবার বিষয় নিয়ে লস্ অ্যালামসের একটি বিশেষ গবেষণাগারে কাজ চলছে। বিষয়টা এমনই, যা নিয়ে প্রত্যোকটি বিশেষজ্ঞই আশান্বিত হয়ে বিগত কয় বৎসর ধরে চিন্তা করে আসছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে কাজ যখন অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব গোপন রাখা হয়। তবে একথা প্রকাশ করবার কারণ এই যে, গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক কর্মীর অভাব এবং এই জটিলতাপূর্ণ কাজে সেই অভাব পুরনের আশায় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা-সম্পন্ন লোকদের আকৃষ্ট করা।

এ কথা অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কেমন করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে, সে কথা কিছুই বলা হয়নি। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, যদি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভাল না হতো তবে গবেষণাগারটি

চালু রাখা হতো না। অদূর ভবিষ্যতেই আমরা পারমাণবিক শক্তি চালিত রকেটের অধিকারী হবো। তারপর কি হবে?

পারমাণবিক শক্তি-চালিত রকেট, আর পারমাণবিক বিস্ফোরক বাহিত রকেট অবশ্য এককথা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আমেরিকানদের কর্পোরাল, রেডষ্টোন প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্রগুলি পারমাণবিক বিস্ফোরক বহন করতে সক্ষম। কিন্তু সেগুলি এখনও গ্যাসোলিন, অ্যালকোহল প্রভৃতি তরল জ্বালানীর সাহায্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে। লস্ এলমোস অ্যাটমিক লেবরেটরী "N-Division" পরিচালনযোগ্য পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাবার উপায়ের সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন।

পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন নটিলাসের সাফল্য থেকে এ-ব্যাপারে কোন রকম সহায়তা হবে না। অপরাপর সাধারণ সাবমেরিনের মত নটিলাসও প্রোপেলারের সাহায্যে পরিচালিত হয়। প্রোপেলার ঘোরাবার শক্তি যোগায় বাষ্প চালিত টার্বাইন। টার্বাইন চালাবার বাষ্প উৎপন্ন হয় পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের সাহায্যে। ব্যাপারটা যদিও কিছু জটিল বটে, তথাপি এর ফলে আগেকার জাহাজের ইঞ্জিন চালাবার জন্যে যেমন কয়লা চুল্লী ব্যবহৃত হতো, তাদের পরিবর্তে পারমাণবিক চুল্লী বসানো হয়েছে, জল ফুটিয়ে বাষ্পে পরিণত করবার উদ্দেশ্য।

কিন্তু রকেটের ব্যাপার হলো সম্পূর্ণ পৃথক। এখানেও জ্বালানী পুড়বে বটে, কিন্তু সেটা পোড়ানো হবে উত্তপ্ত গ্যাস উৎপাদনের জন্যে। এই উত্তপ্ত গ্যাস যখন রকেটের পিছন দিক দিয়ে স্থূলকায় স্রোতের মত প্রচণ্ড বেগে নির্গত হতে থাকবে তখন তারই প্রচণ্ড ধাক্কায় রকেট সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এই ধরণের একটা ইঞ্জিনে পারমাণবিক শক্তি কি ভাবে ব্যবহৃত হবে, সে কথা ভেবে

অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন এবং হতাশভাবে বলেছেন—হতে পারে এটা করা সম্ভব হবে, কিন্তু বুঝতে পারি না, কেমন করে হবে।

যেহেতু কোন গোপনীয়তাই গোপন থাকে না, সেহেতু আমরা অবশেষে জানতে পারবো—'এন-ডিভিসন' কেমন করে এই কঠিন সমস্যা সমধানে ব্যাপৃত হয়েছিল। আমরা আশা করতে পারি, ইতিমধ্যে তাঁরা—সাফল্য লাভে সক্ষম হবেন এবং আশ্চর্য হই এই ভেবে—এর ফল কি হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বড় গল্পের দশ বছর

গত দশ বছরের মধ্যে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটেছে যে, একজন বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমায় এসে বল্লেন যে, মহাশূন্য পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমাদের কোন অর্থব্যয় করা বা চেষ্টা করা প্রয়োজন নেই। যারা এই কথা বলেছে তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে এটাকে অসম্ভব বলে ভাবতো। তারা কেবল একথাটা ভাবে নি যে, পৃথিবীর মানুষ আমরা—এ চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। 'অন্যেরা' মহাশূন্যের কোন জায়গা থেকে, ইতিপূর্বেই সাফল্য লাভ করে ফেলেছে এবং যদি আমরা ভাল ব্যবহার করি, তারা আমাদের শিখিয়ে দেবে। 'অন্যেরা' যে জাহাজে চড়ে বেরিয়েছিল সেগুলি রকেট নয়। সেগুলি ছিল 'পিরিচ'।

ব্যাক্টিরিয়া ঘটিত মহামারীরমত "উড়ন্ত পিরিচ" মহামারীও যেন একই রকমে তার রাস্তা প্রশস্ত করে চলছিল। মহামারীর প্রথম আক্রমনেই অধিবাসীদের বেশ একটা বড় অংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ক্রমশঃ কম-বেশী গুরুতর আকার ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। সামান্য কয়েক জন মাত্র রোগমুক্ত থাকে এবং যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদের বিদ্রূপের পাত্র হয়—রোগমুক্ত থাকাটা যেন একটা অশোভন

ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়। কিছুকাল পরে কিছু সংখ্যক নিরাশ রোগী ব্যতীত অধিকাংশই আরোগ্য লাভ করে।

যদি এটা ব্যাক্টিরিয়া ঘটিত হয় তবে নিরাশ রোগীদের মৃত্যু ঘটে এবং খুব সম্ভব সমাহিত হয়। কিন্তু উড়ন্ত পিরিচ মহামারী আক্রান্ত হতাশ রোগীরা আজও জীবন্ত এবং সাধারণতঃ বেশ মুখর। তারা পরস্পরের মধ্যে এবং জনসাধারণকে বলে যে, কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে সবই জানে কিন্তু এ-বিষয়ে নীরব থাকবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছে। তারা এ বিষয়ে নীরব থাকতে চায় কেন? উড়ন্ত পিরিচ সমর্থকেরা সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয় যে, কর্তৃপক্ষ মনে করেন, জবাব দিলে লোকের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হবে, তারপর যদি জিজ্ঞেস করেন—কেন তোমরা কি সেই কথাটা অর্থাৎ, মহাশূন্য থেকে পরিদর্শকেরা এসেছে বলে আতঙ্কের সৃষ্টি করছো না? —তাহলে তার জবাব পাবেন না।

কেন জবাব পান না—সেটা পরিষ্কার। সত্যিকার জবাব এই হওয়া উচিত—আমরা আতঙ্ক সঞ্চার করি না, কারণ লোকে আমাদের কথায় বিশ্বাস করে না এবং এরূপ দৃঢ় স্বীকৃতিই দেওয়া দরকার। তাছাড়া আমি বলতে পারি—যদি এতে লোকের দৃঢ় ধারণা হয়ে থাকে যে, মহাশূন্য থেকে সত্যই পরিদর্শকেরা এসেছে, তবে জনসাধারণের মনে আতঙ্কের পরিবর্তে খুব সম্ভব কৌতূহলেরই সৃষ্টি হবে।

প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে নিউ ইয়র্ক থেকে বিমানে ডালাস যাত্রার সময় আমি একটা উড়ন্ত পিরিচ দেখেছিলাম। কয়েকটি সরকারী এবং জরুরী অনুরোধ সত্ত্বেও আমি এর বিবরণ দেই নি। আমি যা করেছিলাম তাহলে এই—যে লোকটি আমার পিছনে জানলার সিটে বসেছিল প্রথমে সেটা তাকে দেখালাম এবং যখন সে

ব্যাপারটা অনুধাবনের চেষ্টা করছিল তখন আমি তত্ত্বাবধানকারিণীকে ডাকলাম, তাকে জিজ্ঞেস করলাম—কতদিন ধরে সে বিমানে কাজ করছে—তাতে সে বললো—চার বছরের উপর। আমি তাকে জানালার বাইরে দেখতে বললাম এবং জিজ্ঞেস করলাম—এরূপ দৃশ্য সে পূর্বে কখনও দেখেছে কি না, সে বললো—সে দেখেনি। এতে প্রমাণ হয়, বিমানের তত্ত্বাবধানকারিণী সাধারণতঃ অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকে।

সেই 'পিরিচ', যেটা আমাদের অনুসরণ করেছিল—সত্যই সেটা দেখতে চমৎকার ছিল। আড়াআড়িভাবে কমপক্ষে সেটা ছিল প্রায় ১০০ ফুট। জিনিসটা সম্পূর্ণ গোল, মধ্যটা ঝক্‌ঝকে সাদা এবং চতুর্দিকে রামধনু রঙের ঝালর দেওয়া সেটা আমাদের ডি-সি-৬-এর সঙ্গে সমানভাবে দূরত্ব রক্ষা করে চলছিল এবং মনে হচ্ছিল আমাদের প্রায় ২০০০ ফুট নীচে মেঘের স্তরের চূড়া বরাবর যেন লাফিয়ে যাচ্ছিল, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত সাদা জায়গাটার কেন্দ্রস্থলে কিছু একটা কালো জিনিস—আমাদের প্লেনেরই ছায়া।

এরূপ ঘটনার কথা পদার্থতাত্ত্বিকদের কেবল যে জানা তাই নয়, এর একটা নামও আছে। একে বলা হয় "গ্লোরী"। সূর্য যখন আকাশের উপরে থাকে এবং প্লেন যদি সে সময় মেঘের স্তরের উপর দিয়ে উড়ে যায় এবং মেঘস্তর খুব বেশী ঘন না হলে প্লেনকে মাটিতে যেরূপ দেখায় ঠিক সেরূপ ছবি দেখা যাবে। যখন আমার লাগেজের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন শুনলাম আর একজন যাত্রী তার স্ত্রীকে বলছেন—প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে একটা উড়ন্ত পিরিচ আমাদের অনুসরণ করেছিল।

দু-বছর পরে একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে যখন সেন্টলুই-এর বাইরে যাচ্ছিলাম—আমি আর একটা 'পিরিচ' দেখেছিলাম। প্ল্যাটফরমে

দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শুক্রগ্রহ সন্ধ্যাতারারূপে একটা উজ্জ্বল সার্চলাইটের মত জ্বল জ্বল করছিল। একজন বিমান বাহিনীর অফিসারের সঙ্গে আলোচনার কথা তখন আমার স্মরণ হলো। এই অফিসারটি বলে ছিলেন—শুক্রগ্রহকে যখন সন্ধ্যাতারারূপে দেখা যাচ্ছিল তখন তাকে উড়ন্ত পিরিচ দেখবার জন্যে টেলিফোনে ডাকা সত্ত্বেও ততটা গ্রাহ্য করেননি; কিন্তু শুক্রগ্রহ যখন শুকতারা রূপে দেখা দিয়েছিল তখন তিনি অবস্থাটার একটা অস্পষ্ট দৃশ্য দেখেছিলেন। আমি অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, কি রকম লোক এই রকম টেলিফোন কল দিতে পারে। যাই হোক, প্রত্যেকেই অন্ততঃ শুক্রগ্রহের নাম শুনে থাকবেন।

গাড়ীতে আমার মত পরিবর্তন করলাম, ততক্ষণে আকাশ বেশ কালো হয়ে উঠেছে এবং তুলনামূলক ভাবে শুক্রগ্রহকে আরও যেন বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ট্রেন স্থির গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং সন্ধ্যাতারাটাও যেন তার সঙ্গে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সে সময়ে ট্রেনটা ডানদিকে একটু সামান্য বাঁক নিয়েছিল এবং শুক্রগ্রহটা পিছনে পড়লো বলে মনে হলো, তারপর ট্রেনটা আর একটা বাঁক নিল; তার ফলে সেটা পূর্বের অবস্থায় চলতে লাগলো। পৃথিবীর সকলের পক্ষেই দেখাচ্ছিল যেন আকাশের উজ্জ্বল আলোটা যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের আগে চলে গিয়ে আবার পূর্বের মত সমান ভাবে চলতে লাগলো। গাড়ীতে পড়বার জন্যে যে বইখানা সঙ্গে নিয়েছিলাম, সেই বইখানা না পড়ে ট্রেনের সঙ্গে 'পিরিচে'র সমভাবে চলবার আপাতগতি লক্ষ্য করছিলাম। সেই সময়ে আমার এই দেখার ব্যাপারটাকে 'পিরিচ বাতিকের' চূড়ান্ত বলে এখন অনেক সময় উল্লেখিত হয়ে থাকে। এটা অত্যুক্তি হবে না যে, দেশের সবাই তখন উড়ন্ত পিরিচের কথাই বলতো। এই

সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদই পাঠকেরা ব্যগ্রভাবে পড়তো। উড়ন্ত পিরিচ সম্বন্ধে কোন তথ্য বা সত্য ঘটনার বিষয় বলা হয়েছে—এরূপ দাবী করে যদি কোন নতুন বই বেরুত তবে সেটা নাম করা সর্বোৎকৃষ্ট কোন গল্প-উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশী বিক্রি হয়ে যেতো।

তথাকথিত উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার আছে যেগুলির কথা প্রত্যেকেই শুনে থাকবেন। এর প্রথমটি হচ্ছে উড়ন্ত পিরিচের তথাকথিত আবিষ্কার। কেনেথ আরনল্ড নামে আইডাহোর এক ব্যবসায়ী, যিনি নিজের প্লেন নিজেই চালাতেন তিনি নাকি এর আবিষ্কারক। তারিখটা ছিল ১৯৪৭ সালের ২৪শে জুন। মিঃ আরনল্ড ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে যখন প্লেনে চড়ে ফিরে আসছিলেন তখন মাউণ্ট রেনিয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলটা কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরে আসতে মনস্থ করেন। উদ্দেশ্য ছিল বিধ্বস্ত সি-৪৬ ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের একটু সন্ধান নেওয়া—যার জন্যে সন্ধানদাতাকে ৫০০০ ডলার পুরস্কার দেবার কথা ছিল। মিঃ আরনল্ড ৯ খানা অদ্ভুত রকমের বিমান দেখতে পান। তিনি প্রথমে সেগুলিকে মার্কিন গুপ্ত উন্নয়ন বিভাগের কয়েকটি নমুনা প্লেন বলে ধরে নিয়েছিলেন। এগুলির বিষয় বর্ণনা দিতে গিয়েই অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলেছিলেন—যদি জলের উপরিভাগে সেগুলিকে ছুড়ে দেওয়া যেত তবে তারা ঠিক পিরিচের মত লাফিয়ে লাফিয়ে জল পেরিয়ে যেত।

তারপরের উঁচু পর্যায়ের ব্যাপারটা ঘটে ছিল প্রায় ৬ মাস পরে—যখন কেন্টাকির লুইভিলের নিকটবর্তী বিমান বাহিনীব শিবির থেকে একটা উড়ন্ত পিরিচ দেখা গিয়েছিল। এফ-৫১ নামক ৪ খানা ফাইটার প্লেনের একটা দল তখন সেই পথেই আসছিল—খুব কাছে থেকে উড়ন্ত পিরিচটার উপর তাদের লক্ষ্য রাখতে

বলা হয়। সেই দলের ক্যাপ্টেন ম্যান্টেল সেই বস্তুটাকে অনুসরণ করে ২০,০০০ ফুট উপরে উঠে যান কিন্তু বিমানটি পড়ে গিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা তাদের তেলের ট্যাঙ্কের প্রায় শূন্য অবস্থা নিয়ে ভূমিতে অবতরণ করেন। এই হলো ম্যান্টেল দুর্ঘটনা, যার এখনও প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

তার পরেরটি হলো তথা-কথিত গোরম্যান কেস। ১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর, উত্তর ডাকোটার ফারগো নগরে ঘটনাটি ঘটেছিল। জর্জ এফ. গোরম্যান অনুরূপভাবে একটি এফ-৫১ প্লেনে করে অন্ধকার হবার পর ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং অবতরণ করবার উদ্দেশ্যে 'ক্লিয়ারেন্স'-এর জন্যে অনুরোধ করেন। তাঁকে বলা হয়—আকাশে পাইপার কাব নামে যে আর একখানা প্লেন আছে সেটি নীচে নেমে আসবার পরেই তিনি অবতরণ করতে পারবেন। গোরম্যান সেই প্লেনখানাকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং হঠাৎ আর একখানা প্লেনের লেজের আলো তাঁর ডান দিকে দেখতে পান। আরও বিশেষভাবে নজর করে তিনি দেখেন—সেটা শুধু একটা আলোই মাত্র—আলোটা কোন প্লেনের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। সেটা কি, দেখবার জন্যে তিনি সেটাকে অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু কেবল ছুটাছুটিই সার হলো।

সেই সময়ে এই তিনটিই ছিল সর্বাধিক আলোচিত ঘটনা। শুক্রগ্রহটি আমার ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে চলে যখন এই রকম খেলা খেলেছিল• তখন এসব ঘটনার কথা আমার মনে উদিত হয়েছিল।

পুস্তক ও মতামত

১৯৫২ সালের শেষের দিক পর্যন্ত 'উড়ন্ত পিরিচ' সম্পর্কিত অবস্থা ছিল নিম্নরূপ—পাঁচ বছর পূর্বে কেনেথ আরনল্ড আকাশে থালার মত আকৃতিবিশিষ্ট একটা অদ্ভুত পদার্থের আধুনিক দৃশ্য প্রথম দেখতে পান। তাঁর রিপোর্টের পর ঠিক একই রকমের আরও অজস্র রিপোর্ট আসতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চল-গুলির উপর আকাশে কি ব্যাপার ঘটছে, সেটা জানবার দায়িত্ব বিমান বাহিনীর উপর অর্পিত হয়। বিমান বাহিনী তদনুযায়ী বিশেষ এক অনুসন্ধানের কাজ সুরু করে। উড়ন্ত বোমা সম্পর্কিত বিমান দুর্ঘটনায় তিনজন লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন।

যখন সরকারী মতামত কিছু ছিল না, অন্যদিকে তখন আবার পুস্তকে, প্রবন্ধে প্রচুর পরিমাণে বেসরকারী মতামত পাওয়া যাচ্ছিল। যেসব পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে "The Flying Saucers are Real" নামক মেজর ডোনাল্ড ই. কিহো (অবসর প্রাপ্ত) লিখিত পুস্তকখানিই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশনের তারিখ ছিল ১৯৫০ সাল। এই বইতে কিহো বলেছেন—কেমন করে তিনি সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্যে উড়ন্ত পিরিচ সম্বন্ধে বহুবিধ খবর সংগ্রহ করেছেন। সর্বশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, একটি মাত্র উপায়ে সব জিনিষটার ব্যাখ্যা করা যায়—যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উড়ন্ত পিরিচগুলি সবই এখানে আগন্তুক, তারা অপর কোন গ্রহ থেকে এখানে এসেছে।

এই কথা বলার জন্যে কিহো আমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না—এটা আমি ঠিকভাবেই জানি। কিন্তু তিনি এমন একটা ধারণার

বশীভূত হয়েছিলেন, যেটা বৈজ্ঞানিক গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই অনেক দিন পর্যন্ত জড়িত ছিল এবং নানারকমের পরিবর্তনসহ প্রকাশিত হয়েছিল। তখন একটা ধারণা ছিল এই যে, ছায়াপথের মধ্যে একটা সম্মিলিত অবস্থা আছে, অর্থাৎ আমাদের সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মত সারাটা ছায়াপথ জুড়ে মনুষ্য অধ্যুষিত গ্রহপুঞ্জের বিশাল সংঘ রয়েছে। এই ধারণার সঙ্গে জড়িত গল্পগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়. এক শ্রেণীতে আছে সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বিষয় এবং ছায়াপথ সংঘ প্রথমে পৃথিবীকে নিয়ে সুরু হয়েছিল এই ধারণা। অপর শ্রেণীতে পড়ে কম-বেশী বর্তমান বিষয় তার প্রধান বক্তব্য এই যে, পৃথিবী এখনও এই সংঘভুক্ত হবার মত উন্নত অবস্থায় আসেনি অথবা এমন কি এর সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, এমন অবস্থায়ও নেই। কিন্তু এটা পর্যবেক্ষণাধীন ছিল সুপ্ত শক্তিসম্পন্ন উৎপাত সৃষ্টিকারী অথবা সুপ্তশক্তিসম্পন্ন সদস্যরূপে।

হতে পারে, চিন্তাধারাটা চলেছিল ১৯৫২ সালে। এই ধারণাটা উদ্ভূত হয়েছিল কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গল্প-লেখকের দ্বারা—এবং সেটা গল্পের প্লটের চেয়েও আরও কিছু ছিল। মনে হয় এই লেখকেরা শুধু সত্যটাই অনুমান করেছিলেন।

১৯৫০ সালে কিহোর বই-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুখানা বই প্রথমে বুকষ্টোরে আত্মপ্রকাশ করে। এর একখানার নাম ছিল "Is Another World Watching?" লেখক জেরাল্ড হার্ড। The Other World কথাটায় মঙ্গলগ্রহকে বুঝানো হয়েছিল এবং মিঃ হার্ডের মতে পর্যবেক্ষকরা ছিল অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর এবং শান্তি-প্রিয় Super bees। জনসাধারণ এর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে নি।

"Behind the Flying Saucer" নামে তৃতীয় পুস্তকখানি

লিখেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক স্কুলি। এই বইখানি অনেক বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। একটি উড়ন্ত পিরিচ সত্যই কেমন করে অ্যারিজোনার মরুভূমিতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, স্কুলি তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। "পিরিচের" আরোহী ছিল দু-ফুট লম্বা ছোট ছোট সবুজ রঙের মানুষ। পিরিচটা চৌম্বক রেখা বরাবর তার টানেই পরিচালিত হয়েছিল। পিরিচগুলি এমন একটা ধাতব পদার্থের তৈরী যা ১০,০০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপেও গলে যায় না। স্কুলী এসব জেনেছিলেন, এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ দুজন লোকের কাছ থেকে। তার মধ্যে একজন ছিলেন—চৌম্বক শক্তির সাহায্যে পরিচালন সম্পর্কিত যুদ্ধকালীন মিলিয়ন-ডলার পরিকল্পনা-সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী। লেখক আরও বলেছেন—গভর্ণমেণ্ট অবশ্য সব খবরই রাখে, কিন্তু গোপন রাখবার জন্যেই চেষ্টা করছে। কারণ মহাশূন্য থেকে আগন্তুকেরা আমাদের এখানে এসেছে—জনসাধারণ একথা জানতে পারলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

একজন চতুর সাংবাদিক কর্তৃক ব্যাপারটা শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়লো। স্কুলীর সেই দুজন বিশেষজ্ঞ মোটেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তাদের একজন একটা রেডিওর দোকান চালাতো এবং ষ্টক লেনদেন সম্পর্কিত কোন একটা ব্যাপারে জড়িত থাকায় অপর জনের খোঁজ করা হচ্ছিল। সেই ১০,০০০ ডিগ্রির ধাতু দেখা গেল সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম ছাড়া কিছু নয় (সাংবাদিকটি কোন রকমে তার নমুনা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন)। অবশ্য মিলিয়ন ডলার (বা অন্য যে কোন পরিমান) চৌম্বক গবেষণার পরিকল্পনা সংস্থারও কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোন উড়ন্ত পিরিচ কখনও ধ্বংস হয় নি এবং স্কুলীর এসব বিবরণ জনসাধারণকে বিন্দুমাত্র আতঙ্কগ্রস্ত করতে পারে নি। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে—

চৌম্বক রেখা বরাবর তাদের টানে পরিচালন ব্যবস্থার কথাটা দ্রাঘিমা এবং অক্ষরেখার বরাবর কথাটার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু এতেও ছুটি রহস্যের কথা বাদ পড়ে—একটি হলো—কেন সেই দু-জন বিশেষজ্ঞ এই গল্প আরম্ভ করেছিল ? এবং অপরটি হলো—স্কুলী কি এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছিল—না, নিজের মতলবেই নেমে পড়েছিল ?

এ ছুটির ভিতরে আরও কিছু অনুমান করবার সুযোগ আছে। পিরিচগুলি আমেরিকার কোন গোপন যান্ত্রিক কৌশলও হতে পারে কিন্তু সময়ে সেটাও অসত্য প্রমানিত হয়েছে। যে যান্ত্রিক কৌশল আকাশে উড়ে বেড়ায় তাকে গোপন রাখা যায় না। আগেই হোক, কি পরেই হোক—সেটা প্রকাশিত হয়ে পড়বেই। কিছুকালের জন্যে রাশিয়া এ ব্যাপারে বাহাবা পেয়েছে। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণেই এই ধারণার অবসান ঘটে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়ার তিন গুণ বেশী জমি রয়েছে, যাতে তারা অনায়াসেই কোন গোপন অস্ত্রের পরীক্ষা চালাতে পারে। সেই গোপন অস্ত্রটা যদি কক্ষপথে ভ্রাম্যমান কিছু হতো তবে না হয় সেটা আমেরিকায় দেখা সম্ভব ছিল। কিন্তু তা না হলে রাশিয়া তাদের পরীক্ষামূলক গোপন অস্ত্র সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে পাঠাতে যাবে কেন ? আরও একটা অনুমান ছিল এই যে, সেগুলি মহাশূন্যের প্রাণী—তারা নিজেদের প্রয়োজনেই বায়ুমণ্ডলের খুব নীচুতে নেমে এসেছিল।—এটিও প্রথমে বৈজ্ঞানিকগল্পের উপকরণ হিসেবেই উদ্ভাবিত হয়েছিল—নির্দিষ্টভাবেই স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের নাম করা যায়। তিনিই তাঁর “The Horror of the Heights” পুস্তকে এই কাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন।

সব কিছু বাদ দিয়েও—পিরিচগুলি মহাশূন্য থেকে আগত—এই

ধারণা অনেকের মনেই আধিপত্য বিস্তার করছিল। এস্থলে একথা বলাও দরকার যে, পরবর্তী পুস্তকগুলিতে ছোট ছোট সবুজ মানুষ-গুলির পরিবর্তে স্বাভাবিক আকৃতির সুশ্রী বালিকাদের কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কি দেখা গিয়েছিল ?

উড়ন্ত পিরিচ দেখার ব্যাপারটা চলছে আজ প্রায় দশ বছর ধরে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কোন লোক প্রত্যেকটি পিরিচকে মহাজাগতিক উৎপত্তির চূড়ান্ত প্রমাণ বলে অভিনন্দিত করেছেন। গত দশ বছরে উড়ন্ত পিরিচ যতবার দেখা গেছে, তার সংখ্যা হবে কয়েক হাজার। যেসব বিবরণ কোনও রকমে একটু সন্তোষ-জনক বিবেচিত হয়েছে তার বিষয়েই অনুসন্ধানে ত্রুটি হয়নি। দুঃখের বিষয় কোন চেষ্টাতেই কোন সুফল লাভ করা সম্ভব হয় নি। এই অনুসন্ধানে যেসব প্রমাণাদি পাওয়া গেছে, সেগুলি মোটেই সন্তোষজনক নয়।

সোজা কথা এই যে, এর বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ কিছুই পাওয়া যায় নি। একবার বিমান বাহিনীর একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'প্রমাণ' কথাটার সংজ্ঞা কি ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন—ধ্বংসাবশেষ, যন্ত্রপাতি অথবা মৃতদেহ। এক্ষেত্রেও কোন যন্ত্রপাতি বা ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় নি। উড়ন্ত পিরিচের অবতরণ স্থল বলে যে জায়গা শপথ করে দেখানো হয়েছে—সেখানের মাটিতে তার চিহ্নমাত্র নেই। মৃতদেহ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—যখন সবুজ মানুষের গল্প ছিল মুখরিত, সেই সময়ে দুটি মৃতদেহ দেখানো হয়েছিল বটে, কিন্তু তার একটা ছিল ভ্রূণ আর

একটা ছিল গায়ের লোম কামিয়ে দিয়ে রং মাখানো একটা বানরের মৃতদেহ।

কোনও ফটোগ্রাফও ছিল না, যাতে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকতো না। ফাইটার প্লেনের পাইলটেরা যেসব ফটো তুলেছিলেন সেগুলি নির্ভরযোগ্য বটে; কিন্তু তাতে আলোর একটা আবছা ঔজ্জ্বল্য ছাড়া আর কিছু বুঝাই যায় না। কোন সন্দেহ না করে এর সঙ্গে দুটি রঙীন ছবির ফিল্মও জুড়ে দেওয়া ছিল। এর একটিতে দেখা যায়—আকৃতি বিহীন দুটা গোল জিনিস নীল আকাশের গায়ে পাশাপাশি চলে যাচ্ছে—আকৃতি, পরিমাপ, দূরত্ব অথবা প্রকৃতি—কিছুই ফিল্মের এই ছবি থেকে বোঝা যায় না। একটা জিনিষমাত্র বোঝা যায়—সেটা হচ্ছে দুটি আলোই তাদের নির্দিষ্ট দূরত্ব রক্ষা করে চলে। অপর ফিল্মটিতে আকারবিহীন ধারে দাগকাটা অস্পষ্ট রকমের অনেকগুলি সাদা দাগ আছে। তাদের একটি আবার শেষে অপরগুলি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নৌ-বিভাগের এক যন্ত্রবিশেষজ্ঞ বলেছেন—এদের গতিবিধি সুপরিকল্পিত এবং বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। যদি এটা সত্য হয় তবে বলতে হবে, উক্ত যন্ত্রবিশেষজ্ঞের অনুমান শক্তির প্রাখর্য আছে, নয়তো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন। আমি এই ফিল্মটা বার বার দেখেছি এবং আমি যে কথা বলেছি—সোজা কথায় সেগুলি হলো চতুর্দিকে দাগকাটা।

আর একজন বিশেষজ্ঞ, এই ফিল্মটা দেখে সেগুলিকে ঊর্ধ্বমুখী উষ্ণ বায়ুস্রোতের সঙ্গে বাহিত সি-গাল নামক পাখীর অস্পষ্ট ছবি (ফোকাসের বাইরে) বলে মনে করেছিলেন। হঠাৎ দেখে ঐ ছবিগুলি সম্বন্ধে ঐ রকমেরই একটা ধারণা হয় বটে।

কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় নি—এই কথায় বুঝায় না যে,

অধিক সংখ্যক ঘটনার বিষয় পরিষ্কার ভাবে অনুসন্ধান করা হয় নি। তা করা হয়েছে—তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ পর্যায়ের ঘটনাও ছিল, ক্যাপ্টেন ম্যানটেল নিশ্চয়ই কোন তথা-কথিত স্কাইহুক বেলুনের পশ্চদ্ধাবন করেছিলেন। সেগুলি তখন সবেমাত্র নতুন বেরিয়েছিল, কাজেই তাঁর পক্ষে দেখবার সুযোগ হয় নি। তাঁর বিমান যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে তিনি অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন। কাজেই অক্সিজেনের অভাব এবং জ্বালানী তেলের স্বল্পতার জন্যে তাঁর এই অবস্থা ঘটেছিল (না, তার প্লেনের ধ্বংসাবিশিষ্ট চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় নি। তাছাড়া যা দাবী করা হয়েছিল, সেরূপ তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারও ঘটেনি এবং কন্ট্রোল টাওয়ার ও তার মধ্যে যে বার্তা বিনিময় হয়েছিল তারও বিবরণ রাখা হয় নি—এ কথাই বলা হয়েছিল)।

অন্য কোন প্রমাণ না থাকলেও একটা প্রমাণ আছে—সেটা হলো—চোখে দেখা। আচ্ছা—লোকেরা কি দেখেছে? সাধারণভাবে বলতে গেলে চোখের দেখাটাকে চার রকম পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে—

প্রথম পর্যায়ে পড়ে—ধাপ্পা দেওয়া বা প্রতারণা করা। যারা নিজের প্রচারকার্য চায় বা যাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তারা অনেক সময় এর আশ্রয় গ্রহণ করে। তাছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবেই দু-একটা অতিরঞ্জিত কথা বলা হলে সেগুলি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে আরও অতিরঞ্জিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন—উড়ন্ত পিরিচের সবুজ মানুষের কথা—পরে একজনের কাছে শোনা গেল যে, সেই সবুজ মানুষ দুটি জানতে চেয়েছিল—হলিউড কোন্ দিকে?

দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে এবং এটাই বোধহয় বড় পর্যায়—এমন সব গল্প বা কাহিনী যার মধ্যে এমন কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় না,

যার উপর নির্ভর করে কোন মতামত গঠন করা যায় বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে। আমি নিজে এরকম কয়েকটি কাহিনী শুনেছি।

তৃতীয় পর্যায়টাও বেশ বড়। এর মধ্যে পড়ে সরল বিশ্বাসী লোকের সরল বিশ্বাসের ভুল। অনেকের ধারণা—স্কাই-হুক বেলুনগুলি অর্ধ স্বচ্ছ এবং সেজন্যে অনেক সময় সেগুলিকে অপ্রাকৃতিক বা ভুতুড়ে দেখায়। শুক্রগ্রহ সম্পর্কেও বৃহৎ সংখ্যক লোকের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। তারপর বড় বড় উল্কাপিণ্ড রয়েছে, সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী সেগুলি বরাবর ঠিক একই কাজ করে না। সাদা অথবা সাদা বুকওয়ালা পাখীরাও সময় সময় মানুষের ভুল ধারণার বিষয়ীভূত হয়; লাবক লাইটের কোন কোন ফটোগ্রাফ থেকে অনেকে সেগুলিকে ঐরকমের পাখী বলেই ভুল করে। বেশ ভাল করে দেখা একটা হেলিকপ্টারের সম্বন্ধেও এরকম ভুল করা হয়েছে। এরকম আর একটা বহু-উধৃত ব্যাপার হচ্ছে—খুব উঁচুতে ওড়া জেট প্লেনের নতুন করে জ্বালানী নেবার সময়কার দৃশ্য।

তাছাড়া বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত চোখের ভুলের এমন অনেক ঘটনা আছে, যেগুলি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিচিত, কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত নয়। এক ধরণের মেঘ আছে যেগুলি লেণ্টি-কিউলার, অর্থাৎ লেন্সের মত আকৃতি বিশিষ্ট। সূর্য যখন নীচে থাকে তখন যদি এরকমের মেঘ গঠিত হয় তাহলে অতি চমৎকার 'আলো-কোজ্জ্বল পিরিচ' দৃষ্টিগোচর হবে, যার বিষয় মাত্র কল্পনা করাই সম্ভব। উত্তাপ বদলের একটা ঘটনা আছে—যতই উপরে ওঠা যায় বাতাস ততই ঠাণ্ডা এবং হাল্কা হতে থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে অপেক্ষা-কৃত ঠাণ্ডা বাতাসের স্তর উষ্ণতর বায়ুস্তরের মধ্যে আটকা পড়ে যায়, অথবা এর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় বায়ুস্তর

শো-উইণ্ডোর বড় কাচের মত ব্যবহার করে। এর ভিতর দিয়ে সবই দেখা যায়, কিন্তু সেটা জিনিসগুলিকেও প্রতিফলিত করে, বিশেষ করে আলোগুলিকে তো প্রতিফলিত করেই! যদি রাত্রি বেলায় মোটরে করে কোন পাহাড়ে ওঠা যায় মাথার উপরে এরূপ পরিবর্তিত বায়ুস্তর থাকে, তাহলে মোটরের হেড লাইট দুটি আকাশে এক জোড়া আলোকোজ্জ্বল পিরিচ সৃষ্টি করবে এবং সেই পিরিচ দুটাকে অতি দ্রুতগতিতে আকাশের এক দিক থেকে অপর দিকে চলতে দেখা যাবে।

কিন্তু এত সব ব্যাখা সত্ত্বেও সত্যিকারের অসংখ্য অজানা ঘটনা রয়েছে—যাদের জন্যে এসব ব্যাখ্যায় কোন ভাল ফল পাওয়া যাবে না।

আমাদের চতুর্দিকের বিশ্ব

একথাটার পুনরাবৃত্তি করা দরকার যে, তথাকথিত উড়ন্ত পিরিচের আন্তগ্র্হজাগতিক উৎপত্তি রহস্য সম্বন্ধে যে সব সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ রয়েছে, অন্য কোন ব্যাখ্যা না থাকার ফলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। অধিকাংশ দৃশ্যকেই হয় ভ্রান্তি, না হয় প্রাকৃতিক ঘটনা (যা ভুলেরই অন্যতম পর্যায়) বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; কিন্তু কতকগুলি অব্যাখ্যাত থেকে যায়। কিন্তু অনেক সময় আমাকে বলা হয়েছে যে, এই অব্যাখ্যাত ঘটনাগুলিও আন্তগ্র্হজাগতিক।

আমি যখন উত্তর দিয়েছিলাম যে, এর কোন যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নেই, তখন প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এই বিশ্বের অন্য কোথাও অন্য রকমের জীব থাকতে পারে—একথা আমি অস্বীকার

করি কিনা। একটা ক্ষেত্রে রেডিও আলোচনার সময় আমার প্রতিবাদী বললেন—কোন বিজ্ঞানী সংখ্যাতাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, অন্য কোথাও নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান জাতির অস্তিত্ব আছে। তারপর তিনি সংখ্যাতত্ত্ব উদ্ধৃত করতে সুরু করলেন। আমি জানি—সেগুলি নিজের উদ্দেশ্য সমর্থনের জন্যে সংগৃহীত, কারণ সেগুলি ছিল আমার নিজের। প্রায় দু-বছর পূর্বে আমার একটি ছোট গল্পের পুস্তকের ভূমিকা হিসেবে প্রকাশ করেছিলাম।

এই হলো ব্যাপার—যেমন ধারায় যুক্তি চলছিল। আমাদের ছায়াপথে, হিসেব করে দেখা গেছে, দুই হাজার কোটি নক্ষত্র বা সূর্য আছে। সেগুলি বিভিন্ন ধরণের, কিন্তু আমরা একটু কমেমেজেই হিসাব ধরে নিচ্ছি—এসব সূর্যের প্রত্যেক দ্বিতীয়টিই আমাদের সূর্যের মত—জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন 'মেন সিকোয়েন্স' সেই মেন সিকোয়েন্সের অন্তর্গত। এই কথা ধরে নেবার কোন কারণ নেই যে, কেবল মাত্র মেন সিকোয়েন্সের সূর্যগুলিরই গ্রহ থাকবে, কিন্তু আমরা সেটাই ধরে নিচ্ছি। কাজেই আমাদের ছায়াপথে গ্রহসমন্বিত এক হাজার কোটি সৌরজগৎ অর্থাৎ সৌরপরিবার থাকবে।

আমাদের সৌরজগতে দুটি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে বলে জানা গেছে; যথা—পৃথিবী ও মঙ্গল। কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি—১০০ গ্রহের মধ্যে মাত্র একটা গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে। এর অর্থ হলো—আমাদের ছায়াপথে জীবন সমন্বিত ১০ কোটি গ্রহ আছে। এখন আমরা বলবো—১০০টি জীবন সমন্বিত গ্রহের মধ্যে একটি মাত্র গ্রহের অবস্থা বুদ্ধিমান জীব উৎপাদনের অনুকূল। তাহলে ১০ লক্ষ গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বুঝায়। আর একটু অগ্রসর হয়ে যদি ধরা যায় যে, ১০০ গ্রহের মধ্যে একটিতে মাত্র বুদ্ধিমান জীবেরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে এবং

মহাশূন্য পরিভ্রমণ আরম্ভ করেছে তাহলে আমরা ১,০০,০০০ মহাশূন্য বিজয়ী জাতির অস্তিত্বের সন্ধান পাই।

কাজেই মহাশূন্য থেকে পরিদর্শক আগমনের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু উড়ন্ত পিরিচ নিশ্চয়ই তার সব সর্ত পূরণ করতে পারে না। যা কিছু তাদের সম্বন্ধে বলা হোক না কেন, তাদের ব্যবহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। যদি তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে ইচ্ছা করতো তবে অন্য অনেক রকম বিভিন্ন উপায়েই তা করতে পারতো। কিন্তু যে উপায় তারা অবলম্বন করেছে নিশ্চয়ই সেই উপায় নয়। যদি তারা গুপ্তভাবে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ইচ্ছা করে থাকে তবে বলতেই হবে তারা খুবই অসতর্ক। তাছাড়া এগুলি যদি মহাশূন্য-যান হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সমর্থকেরা তাদের সম্বন্ধে যা বলে, সেরূপ ব্যবহার কখনও করতো না।

ধরে নিচ্ছি, আমরা এবিষয়ে একমত যে তাদের পরিচালন ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে অনেক উন্নত। এমন কি, তাদের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শব্দবিহীন হতে পারে। কিন্তু কোন পদার্থ যদি আমাদের বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে চলতে থাকে তাহলে একটা সংঘাত-তরঙ্গ বা শক-ওয়েভ উৎপন্ন হবে, পরিচালন ব্যবস্থা যাই হোক না কেন। যাহোক, শক-ওয়েভের কোন শব্দ শোনা গেছে, এমন কথা কেউ কখনও বলেনি। শক্-ওয়েভের শব্দ এমন একটা কিছু যা ঘুমন্তই হোক, কি জাগ্রতই হোক, শান্ত হোক, কি উত্তেজিতই হোক— সকল অবস্থায়ই শুনতে পাবার কথা।

সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় এবং মাঝে মাঝে বেশ জোর দিয়ে বলাও হয় যে, উড়ন্ত পিরিচ নিঃশব্দে চলাফেরা করে। এতে

দুটি জিনিষের মধ্যে একটাকেই বুঝাতে পারে। হয় তারা শব্দের গতির চেয়ে কম গতিতে গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত বেলুনগুলি যেমন ঊর্ধ্বাকাশে ভেসে বেড়ায়, সেরূপ গতিতে চলে অথবা সেগুলি মোটেই কোন পার্থিব পদার্থে গঠিত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিপরীত ভাবে পরিবর্তিত বায়ুস্তরে প্রতিফলনের কথা বলা যায়, যা আকাশের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত কোন রকম শক-ওয়েভ বা সংঘাত তরঙ্গ সৃষ্টি না করে যে কোন গতিতে ছুটতে পারে।

একটা সম্ভাব্য ব্যাপার এই হতে পারে যে, ঐ পিরিচগুলি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক না হয়ে কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারও হতে পারে—অতীতে যা প্রায়ই দেখা যায়নি। "প্রায়ই দেখা যায়নি" কথাটা আমি বিবেচনা করেই বলেছি; কারণ ১৯৪৭ সালে কেনেথ আরনল্ডই আকাশে অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখবার কথা সর্বপ্রথমে বলেননি। কারণ কয়েকজন লোক কষ্ট স্বীকার করে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাসমূহের ১৯৪৭ আগেকার সংখ্যাগুলি থেকে কতক রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। এই রিপোর্টগুলি এখন প্রকাশিত হলে দেখা যেত সেগুলি উড়ন্ত পিরিচের বিবরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে একটি রিপোর্ট এক শতাব্দীর বেশী পুরনো। এই তথ্যগুলিই এই ব্যাপারকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলে নির্দেশ করে।

কিন্তু এটা কি হতে পারে? কেউ সোজাসুজি একথা বলতে পারে যে, আকাশে উড়তে সুরু করবার পূর্বে আমরা বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার চেষ্টা করি নি, যাতে আরও কোন নতুন ঘটনা আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় থাকতে পারে। কথাটা সত্য—সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, 'যে কতকগুলি অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটন করবার পথ পরিষ্কার করে দেবে, সেটি কোন রকমেই নতুন নয়।

বল-লাইটনিং নামে পরিচিত একটা বৈদ্যুতিক ঘটনা আছে। ঘটনাটা খুবই কম ঘটে, কিন্তু আলপস্ পর্বতের উত্তর দিকের ঢালুতে ততটা দুর্ঘট নয়। সেখানে বজ্রপাত সহ ঝড়বৃষ্টির পর (ঝড় বৃষ্টির সময়ে নয়) এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। আকৃতিতে বল-লাইটনিংকে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত নীলাভ-সাদা একটা গোলকের মত দেখায়। গোলকটার ব্যাস হবে প্রায় ৬ থেকে ৮ ইঞ্চির মত। জিনিসটাকে পরিষ্কার গোল দেখায়, কিন্তু ফটোগ্রাফে ধারগুলিকে দেখা যায় অবিন্যস্ত, ফেকৃরি বার করা। সম্ভবতঃ গোলকটা থেকে প্রচুর পরিমাণে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি নির্গত হয়—এই রশ্মিকে খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু সেগুলি ফটোগ্রাফির ফিল্মে ধরা পড়ে। এই কারণে চোখে পরিষ্কার গোল দেখলেও ফটোপ্লেটে ফেকৃরি বার করা গোলের মত দেখায়।

বল লাইটনিং সাধারণতঃ কয়েক মিনিটের জন্যে চতুর্দিকে ভেসে বেড়ায় এবং তারের বেড়া প্রভৃতির মত কোন তড়িৎ-পরিচালক পদার্থ পেলে তাকে অবলম্বন করে চলতে থাকে। তারপরে হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। কোন সময় কোন গতিকে বারুদ স্তূপের সংস্পর্শে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নানা রকম ক্ষতি সাধন করে। সময় সময় একে নিজে নিজেই সঙ্কুচিত হতে দেখা গেছে। এই সঙ্কোচনের দরুণ অবিশ্বাস্য গতিতে সরিয়ে নেবার চক্ষুসংক্রান্ত ক্রিয়ার ফল উৎপাদন করে।

আমি এমন একটি ঘটনার কথাও জানিনা, যেটা পর্বতের উপরে ঘটেনি। একটিমাত্র পশ্চিম গোলার্ধের রিপোর্ট, আমি জানি, ডেনভার থেকে এসেছিল। কাজেই এ সন্দেহ হতে পারে যে, সমুদ্র-পৃষ্ঠের সমতলে বাতাস খুব ঘন বলে সেখানে এরূপ ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় না।

যে অজানা ঘটনাগুলি পাইলটেরা কয়েক হাজার ফুট উপরে দেখেছেন, যেগুলি রাডারে ধরা পড়েছে, চোখে সুস্পষ্ট রূপে দেখা গেলেও ফটো ফিল্মে অস্পষ্ট রূপে দেখা দিয়েছে সেগুলি কি বল লাইটনিং-এর ঘটনা? আমি নিজে এরূপ মনে করি। পরিদর্শনকারী মহাশূন্য-যানের ক্ষেত্রেও আগের অধ্যায়ে বর্ণিত বিমান বাহিনীর অফিসারের সঙ্গে আমি একমত; অর্থাৎ আমাকে যদি ধ্বংসাবশেষ, যন্ত্রপাতি অথবা মৃতদেহ দেখানো হয়, তবেই আমি বিশ্বাস করতে পারি।

ইতিমধ্যে আমাদের নিজেদের ব্যবস্থায় রকেট ব্যবহার করে মহাশূন্য পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ আমরা জানি "অপরেও" এগুলি করছে। তারাও আমাদের গ্রহেরই মানুষ এবং আমাদের প্রথম কাজই হলো তারা যা করছে তার সঙ্গে সমান তালে চলা এবং তার থেকে আরও এগিয়ে যাওয়া।